পলাশ বনের গোধূলি

ফণিভূষণ আচার্য

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শৈশব থেকে যারা আমার মন জুড়ে আছে, তাদের অনেকেই আজ এ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের ঢেউ মন থেকে তাদের স্মৃতি মুছে নিয়ে যেতে পারে নি। তাদেরই কথা বলতে গিয়ে আজ মনটা হঠাৎ ভিজে উঠলো। তাদের কথা সবখানি বলতে পেরেছি কিনা জানি না। যা বলতে পেরেছি, তা সকলের। যা বলতে পারি নি, তা আমার নিজস্ব।

লেখক

এই গ্রন্থকারের বই

ধূলি মুঠি সোনা (কবিতা)

হলুদ পাখির ডাক (উপন্যাস)

মহুয়ার নেশা (গল্প) যন্ত্রস্থ

না, আর কিছুই মনে পড়ে না রাঘবের।

একটা ক্ষ্যাপা ঢেউএর ওপার থেকে বুলানের অসহায় চিৎকার রাঘব শুনেছিল মাত্র। তারপর অশান্ত ঢেউএর উন্মত্ত কোলাহল। সমুদ্র তার শত বাহু মেলে যেন তাকে গলা টিপে পিষে মেরে ফেলতে চায়। সমুদ্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করে ভাসবার চেষ্টা করলো রাঘব। এখন সে যদি এক টুক্‌রো কাঠ কিংবা বাঁশ পায়, তাহলে বেশ হয়। কিন্তু কোথাও কিছুই নেই। ডিঙিটাকে সমুদ্র অনেক আগেই গিলে খেয়েছে। এবার তাকে গিলতে এগিয়ে আসছে। হাতে পায়ে জল ঠেলে সে ভেসে উঠলো ঢেউএর মাথার ওপরে।

কিন্তু বুলান? বুলান কই? অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে, সে তাকালো। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। সমুদ্র যেন তার শত সহস্র নাগ-নাগিনীকে পাতালপুরী থেকে মুক্তি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

রাঘব বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে : বুলান—

না। কেউ কোথাও নেই। ঢেউএর হাহাকার অট্টহাসির মধ্যে তার ডাক কোথায় তলিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে আকাশে তাকালো। আকাশে ঘন পুরু মেঘের দুরন্ত ছুটোছুটি। তার ওপর ছিল বড়ো বড়ো ফোঁটায় একটানা বৃষ্টি। আর ছিল সমুদ্র-ও-আকাশ-তোলপাড়-করা অশান্ত ঝড়।

দাওয়ায় বসে রাঘব জাল বুনছে। জাল বুনতে বসলেই তার সেই

একদিনের স্মৃতি মনের ওপর ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই সে হয়ে যায় অতীতের মানুষ।

মনে পড়ে, সেদিন সন্ধের একটু আগে ঘনাই মণ্ডল সমুদ্রের ধারে কি যেন দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটতে ছুটতে এসেছিল। নিশ্চয়ই কোন খবর আছে। ঘনাই পাকা শিকারী। সমুদ্রের মাছের নাড়ি-নক্ষত্র তার সবই জানা। তার চোখে মুখে সেদিন একটা খুশির ঝিলিক লক্ষ্য করেছিল রাঘব।

ঃ কি হয়েচে ঘনাই ?

আবেগে ঘনাইর গলাটা প্রায় বুজে এসেছিল। একটা ঢোক গিলে সে বলেছিল—

ঃ এক্‌খুনি গাঁয়ে একটা খবর দিতে হবে—

ঃ ক্যানে ? কি হযেচে শুনি—

উত্তরে ঘনাই শুধু হাতদুটো মুঠো করে রাঘবের নাকের কাছে এগিয়ে এনেছিল।

ঃ কিছু পাচ্চিস ?

রাঘবও কম শিকারী নয়। সমুদ্রের সঙ্গে, সমুদ্রের মাছের সঙ্গে আবাল্য তার পরিচয়। তার ওপর সে গাঁয়ের মোড়ল। মাছমারি গাঁয়ের মোড়ল হতে গেলে তার যে ও-সব জানা চাই।

ঘনাইর হাতের গন্ধ পেয়ে রাঘবের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বিস্ময়ে আনন্দে সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে ঃ ইলিশ—

ঘনাইর চোখে মুখে একটা আনন্দের ঢেউ ফেটে পড়লো যেন।

ঃ তাহলে গাঁয়ে তো একটা খবর দিতে হয় ?

ক'মাস ধরে মাছের ব্যাপারে মাছমারি গাঁয়ের প্রতি সমুদ্র বড়ো কৃপণ হয়েছিল। সারাদিন মাঝ-দরিয়ায় জাল পেতে যা পেয়েছে, তাতে কারো সংসার চলে নি। চলার কথাও নয়। সত্যি, সমুদ্রকে এত কৃপণ হতে তারা কখনো দেখে নি।

আর আজ মেঘ না চাইতেই জল! অসময়ে ইলিশ ?

ঘনাইর দুটো হাত নাকের কাছে এনে রাঘব আবার একবার ভাল করে শুঁকে নিল। না, মিথ্যে নয়। ইলিশের চাক এসেছে। কিন্তু এই অসময়ে? হোক অসময়। সমুদ্র যখন তাদের প্রতি সদয় হয়ে ডেকেছেন, তখন কি তারা চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারে?

ঃ যা ঘনাই, গাঁয়ে শিগ্গির একটা খবর করে দে—

ঘনাই পেছন ফিরে দৌড় দিতেই রাঘব তার বড় ছেলেকে ডাক দেয়ঃ বুলান—

বিয়ে হয়ে ছেলেটার যে কি হয়েছে! কোনদিন সে এমন ঘরকুনো ছিল না। বাপের মতো বেপরোয়া ছেলেটা নতুন বউ পেয়ে ঘর থেকে একেবারে বেরুতেই চায় না। রাঘব একটু হাসে। কদিনই বা বিয়ে হয়েছে ওদের? তিন মাস। তাই বলে সব সময়ই বউর কাছে বসে থাকতে হবে? রাঘবের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। এ রকম হলে গাঁয়ের লোকেই বা বলবে কি?

ঃ বুলান—

বুলানের কোন সাড়া নেই।

সমুদ্র থেকে ফিরে এসে সেই-যে বউর কাছে গেল আর ঘর থেকে বেরুলো না। এভাবে কেমন করে চলবে? সমুদ্রের ডাক এসেছে, সমুদ্রে যেতে হবে তো! বউর কাছে বসে থাকলে তো আর পেট চলবে না।

ঘরের দিকে ভারি ভারি পা ফেলে এগিয়ে যায় রাঘব।

ঃ বুলান, এ্যায় শুনচিস্—

ঘরের ভেতর থেকে বুলানের গলা শোনা যায়ঃ ক্যানে?

ঃ শিগ্‌গির বাইরে আয়। সমুদ্দুরে যেতে হবে—

ঃ ক্যানে?

ঃ ইলিশ হয়েচে। ঘনাই দেখে এয়েচে। গাঁয়ে খবর হয়ে গেচে। সোব্বাই যাবে—

ময়না বউ উনুন ধারে বসে চাল ভাজছিল। তার গা ঘেঁষে বুলান বসে গল্প বলছিল। কতো কি গল্প! কতো অর্থহীন সব গল্প! ময়না

বউর বড়ো ভালো লাগে শুনতে। বুলানের গল্প যেন ফুরাতেই চায় না। এমন সময় তার গল্পের সূতো ছিঁড়ে গেল।

দরজার কাছে রাঘবের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সে উঠে এগিয়ে আসে।

ঃ ইলিশ হয়েচে। দেরি করিস নি এক্কেরে। তৈরি হয়ে লে শিগ্‌গির—

বাপের কাছে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে বুলান পারলো না। কিন্তু আজ সমুদ্রে যেতে তার একেবারে ইচ্ছে ছিল না। তবু বাপকে খুশি করবার জন্যে আর দেরি না করে মোটা লগি বাঁশ, জাল আর দড়িদড়া বের করে এনে বাঁধতে লেগে গেল।

রাঘব উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় চিৎকার করে ঃ মংলা, বুধিয়া— কোথায় গেলি রে সোব্—

মংলা আর বুধিয়া রাঘবের অন্য দুই ছেলে।

রাঘব ডাক দেয় ঃ মংলা—

মংলা গাঁয়ের দিকে গিয়েছিল। ঘনাইর মুখে ইলিশের খবর পেয়ে সে ঘরের দিকেই ফিরে আসছিল। ডাক শুনে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো।

সেদিন সারাদিন আকাশে মেঘ জমেছিল। মেঘে মেঘে কখন সন্ধে ঘনিয়ে এলো, কেউ জানতেই পারলো না। মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবতে যাচ্ছে। রং বদলাচ্ছে আকাশের। পশ্চিম আকাশের দিকে তাকানই যায় না।

গাঁয়েব ঠিক পশ্চিম প্রান্তের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পলাশের বন। ফাল্গুন-চৈত্রমাসে ফুল ফুটে বনের মাথা ভরে যায়। যেন লাল টক্‌টকে আগুন জ্বলে ওঠে বনের মাথায়। এ বছর ফুল ফুটে কবে ঝরে গেছে। এখন আষাঢ় মাস. কিন্তু আজ পলাশ বনের মাথায় যেন সেই রক্তিম আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কোনদিন কোন গোধূলি এমন করে জ্বলে না। সামনের বালিয়াড়িটার গায়ে স্থলকলমীর পাতায় পাতায়ও রক্ত-বমনের চিহ্ন।

সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নাই। গাঁয়ের জেলেরা দলে দলে বাঁশে করে জাল বেঁধে সমুদ্রের চরের দিকে চলেছে।

আজ একটা সুযোগ এসেছে তাদের সামনে। এমন সুযোগ কদাচিৎ আসে। এ সুযোগ তারা কিছুতেই হেলায় হারাবে না।

ময়না বউ চাল-ভাজা নিয়ে বেরিয়ে এলো। বুলানের নববিবাহিতা বধূ। লজ্জার আবীর-গোলা এখনও তার দুই গালে, চোখের চাহনিতে লেগে আছে। নাকি, সে ঐ পশ্চিম আকাশের রক্তিম বিহ্বলতার অফুরন্ত উল্লাস!

বুলানকে উদ্দেশ করে ময়নাবউ বলে ঃ চালভাজাগুলো খেয়ে যা—

বুলানের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠলো। বালিয়াড়ির ওপারে সমুদ্রের কতগুলো ঢেউ একসঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লো যেন। বুলান বাপের মুখের দিকে একবার তাকালো। তারপর কি ভেবে বললো ঃ না। গামছায় বেঁধে দে, সমুদ্দুরে খাবো—

ময়না বউ চালভাজাগুলো গামছায় বেঁধে দিয়ে গেল। এমন সময় বুলান একখানা দড়ি আনতে ঘরের ভেতর গেল। দড়িরই বা আর কি দরকার? দরকার না থাকুক, তবু বুলানের একবার ঘরের ভেতর যাওয়া চাই।

রাঘব ভোলেনি, তিনমাস আগে বুলানের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এদিকে যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের সবাই যে চলে গেল—

ঃ বুলান—

বুলান ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জাল-বাঁধা বাঁশের একদিক মংলাকে দেখিয়ে অন্যদিকটা কাঁধে তুলে নেয়। ওদের পেছনে রাঘব চালভাজার গামছা, হুঁকো কলকে, জলের কলসী আর মাছের ঝুড়ি বাঁকে সাজিয়ে নিয়ে এগোতে থাকে।

আসন্ন সন্ধের রক্তিম আলোর ভেতর দিয়ে তিনটি বলিষ্ঠ ছায়ামূর্তি দক্ষিণের বালিয়াড়ির দিকে হেঁটে যায়। রাঘব কি ভেবে একবার পেছন ফিরে তাকায়।

ঃ বুধিয়া কুথায় ? ওকে ডেকে আনিস্ বউ—

ময়না বউ দোর গোড়ায় একটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা গায়ে সূর্যাস্তের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

বুলানের মাকেও রাঘব এইভাবে কতোদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। বুলানের মার মুখটা সে মনে করতে চেষ্টা করে। না, মনে পড়ে না। কতোদিন আগে বুলানের মা মরেছে, তাও তার মনে পড়ে না। সব ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

আর কোনদিনই বুলানের মা তার সমুদ্রে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে না।

পেছন ফিরে রাঘব চেঁচিয়ে বলে যায়ঃ আর মুরগীগুলোকে ঘরে ডেকে নিস্ বউ—

বালিয়াড়ির ওপরে উঠতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো রাঘব দলুইর। তা কি কোন আশঙ্কায় না আনন্দে, তা সে বুঝে উঠতে পারেনা।

একসঙ্গে খান বারো চৌদ্দ ডিঙি প্রস্তুত। আর তার আশে পাশে পঁচিশ তিরিশটা মানুষের ছায়া নানা ব্যস্ততায় ঘোরাঘুরি করছে। ওদিকে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের রক্তিম উচ্ছ্বাস। সামনে অন্তহীন একটি রক্তের সমুদ্র।

রাঘবের যৌবন ফুরিয়েছে। কিন্তু রক্তে এখনও উত্তাপ আছে। তারও শরীরে আজ রক্তের ঢেউ উঠছে, আর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে যাবার মুখে এমনি তার বুকের রক্ত চিরকাল নেচে ওঠে।

সমুদ্রের জল আঁজ্‌লা ভরে নিয়ে সে নাকের কাছে এনে শোঁকে। ঠিকই বলেছে ঘনাই। ইলিশের চাক বেরিয়েছে আজ সমুদ্রের জলে খেলতে।

পেছনে ঘনাইর গলা শোনা যায়ঃ কি মোড়ল, তোকে ঠিক বলেচি কি না ?

ঘনাই হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে

: ঠিক—

: কিন্তুক—

ঘনাইর গলায় ভয়ের ছোঁয়াচ্। রাঘব চেয়ে দেখলো ঘনাইর সমস্ত শরীরটা ভয়ানকভাবে লাল হয়ে উঠেছে। সে জিজ্ঞেস করে: কিন্তুক কিরে?

: আকাশটা দেখেচিস?

রাঘব মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকায়।

: ওদিকে লয় রে, পচ্চিম দিকে তাকা—

: হুঁ—

: কেমন মনে হয়?

: ভালো লয়—

: তাহলে কি করা যাবে, বল্ দি'নি—

: যাওয়া হবে—

: যাওয়া হবে?

: হুঁ। জেলের জাত; আকাশ আর সমুদ্দুরকে ভয় পেলে চলে নি।

একটু থেমে সে বলে: জেলেদের তিন বউ। ঘরে এক বউ, এক বউ আকাশ, আর এক বউ সমুদ্দুর। তিন বউ লিয়ে তাকে ঘর করতে হয়। ভয় পেলে চলবে ক্যানে?

সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ঢেউ ওদের পায়ের কাছে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে হেসে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

বারো বছর আগের সেই পলাশ বনের গোধূলির কথা রাঘব দলুই আজও স্পষ্ট মনে করতে পারে। এমন ফুল পলাশ বনের মাথায় কখনো জ্বলেনি, ইলিশের এমন সুযোগ মাছমারি গাঁয়ের ভাগ্যে কখনো

আসেনি, আর সমুদ্রকে এমন মাতাল হতে এ গাঁয়ের জেলেরা কখনো দেখেনি।

দাওয়ায় বসে জাল বুনতে বুনতে সেদিনের সব কথাই একে একে রাঘবের মনে পড়ে যায়। যেন মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। এখনও বাসি হয়নি। পলাশবনের মাথার টাট্‌কা গন্‌গনে আগুনের মতো সে সব কথা আজও উজ্জ্বল। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বারোটা বছর হু হু করে কেটে গেছে। হ্যাঁ, তারপর পলাশ বনের মাথায় বারো বার আগুন জ্বলেছে, আগুন নিবেছে। সেদিনের রাঘব দলুইর মুখের ভাঁজগুলো আরও গভীর হয়েছে। মুখের ভাঁজগুলো সংখ্যায়ও আরো বেড়েছে। মাথার চুলে সাদার ভাগও অনেকটা বেড়ে গেছে। কিন্তু চোখ দুটোকে বার্ধক্য ঢাকতে পারেনি। পলাশ বনের কিছু আগুন যেন তার চোখ দুটোতে ঠিক্‌রে পড়েছে। সে আগুন নেভে না। কখনো নেভে না।

জালের গেরো ফেরাতে গিয়ে সূতোটা ছিঁড়ে গেল।

ঃ ধেৎ—

ছেঁড়া সূতোয় গিঁট্‌ দিয়ে সে আবার জাল বোনায় মন দেয়।

সেদিন সেই রক্তাক্ত সন্ধ্যেয় বারো চৌদ্দখানা ডিঙি প্রস্তুত হয়ে দক্ষিণ মুখে যাত্রার জন্যে প্রতীক্ষার ঢেউ গুনছিল।

এলো সেই প্রতীক্ষার ঢেউ।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়—

বুলান প্রাণপণে ঠেলে ডিঙিটাকে ঢেউএর মুখে তুলে দিল। অমনি ডিঙিখানাকে প্রায় লুফে নিয়ে ঢেউটা বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে চললো। কিন্তু সামনেই সিঁদুরের পাহাড়ের মতো একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এগিয়ে আসছে। তারপর একটা, তারপর আরো একটা। বাপব্যাটায় শক্ত হাতে ঢেউ কাটিয়ে ডিঙিটাকে দক্ষিণ মুখে নিয়ে চললো।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়—

সমস্বরে শোনা গেল জেলেদের সমুদ্র বন্দনার রেশ। পিছন ফিরে ওরা দেখলো, বাকি ডিঙিগুলো সমুদ্রের ঢেউএর মুখে বেলেহাঁসের মতো ভেসে উঠেছে। ঢেউ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে আর বেশি দেরি নেই ওদের।

এখানে ঢেউ কম। যা আছে তাদের দাপটও কম।

এখানে একটু অপেক্ষা করা যাক্।

পেছনের ওরা এসে পড়লো। ঘনাইর ডিঙিটা দোল খেতে খেতে কাছে এগিয়ে আসে। মুখ বাড়িয়ে ঘনাই বলে ঃ মেঘটা সিঁদুরে বটে, কিন্তুক ডর পাবার কিছুই নাই। কি বল্ মোড়ল ?

ঃ না, ডর পাবার কিছুই নাই।

কিন্তু রাঘব জানে, পশ্চিম আকাশে পলাশ বনের মাথার মতো ঘনাইর মনেও ভয় জমাট বাঁধছে। তা বাঁধুক। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার সময় এখন নেই।

এদিকে সন্ধে উতরে রাত ঘনিয়ে আসছে। দেরি করা চলবে না। আরো এগিয়ে যেতে হবে। আবার দোল খেতে খেতে মাছমারি গাঁয়ের ডিঙিগুলো দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকে।

রাঘব বারে বারে জলে হাত ডুবিয়ে শুঁকতে থাকে। হ্যাঁ, গন্ধটা আরো স্পষ্ট হচ্ছে। এক সময় রাঘব মুখে আশ্চর্য ভঙ্গিতে হিস্ হিস্ শব্দ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জেলেরা ডিঙি থামিয়ে জালগুলো প্রস্তুত করে নিয়ে জলে নামিয়ে দেয়।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলো। আর কারো মুখ দেখা যায় না। ডিঙিগুলোর অস্তিত্বও বোঝা যায় না। এক এক মুহূর্তের জন্যে রাঘব ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা, সে সমুদ্রে আছে না ডাঙায় আছে। কেবল ঢেউ এর বুকে দোল খাওয়া ছাড়া সমুদ্রের অন্য কোন অনুভূতি নেই। জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ ডিঙির গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন কতো আদরে সমুদ্র ডিঙিগুলোর গা চেটে দিচ্ছে।

বসে বসে ঝিম ধরছে রাঘবের। অন্ধকারে দেশলাই জ্বেলে কাঠ কয়লা ধরিয়ে তামাক সাজলো রাঘব। একমনে অন্তহীন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তামাক টানতে থাকে সে।

রাত ঘন হতে থাকে। বাতাস কখন পড়ে গেছে।

প্রথম মাছ উঠলো সুন্দর ধাড়ার জালে। সুন্দর দূর থেকে চিৎকার করে খবরটা মোড়লকে জানায়ঃ মোড়ল, আমার জালে উঠেচে একটা—

রাঘব তামাক টানতে টানতে জবাব দেয়ঃ উঠেচে? সাবাস্—

জালে মাছ ভিড়েছে—রাশি রাশি। এমন সুযোগ মাছমারির ভাগ্যে কখনো আসে নি। এখন শুধু ধৈর্য ধরে ডিঙিতে তোলা। বাস্। তারপর ডাঙার ছেলে ডাঙায় ফিরে চলো।

কিন্তু এই অন্ধকার বড়ো সর্বনেশে। এর ভেতরে অনেক অশরীরী ছায়া ঘুরে বেড়ায় কিনা। তাদের নিশ্বাস লাগলে আর কথাই নেই। সব মাছ কোথায় উবে যাবে। জলের মাছ, জালের মাছ, ডিঙির মাছ—সব এক নিশ্বাসে ফাঁক হয়ে যাবে।

ভয় অন্য কিছুকে নয়, ভয় শুধু এই অন্ধকারকে।

কি ভয়ানক অন্ধকার! এমন অন্ধকারে রাঘব কখনো পড়েনি। এমন অন্ধকারে তাঁরা সব বেরোন, যাঁদের নাম করতে নাই। মনে মনে মা গঙ্গার নামে রাঘব দলুই পাঁচ সিকের পূজো মানে।

ঃ হেই মা গঙ্গা, অলুক্ষুণে কিছু যেন না ঘটে।

বিড় বিড় করে রাঘব কথাগুলো উচ্চারণ করে আর হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকায়।

ঃ কিছু বলচিস্ বাপ্?

বুলান জিজ্ঞেস করে।

ঃ না। কিছু বলিনি তো—

একটু থেমে বলেঃ দ্যাখ্ দি'নি, জালে কিছু ভিড়েচে কিনা—

বুলান বলে উঠেঃ চুপ্ চুপ্, ওরা সোব্ কি বলতিচে যেন—

এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো অন্যান্য ডিঙির জেলেরা। রাঘব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেঃ অ সোন্দর, কি হইচে ?

সুন্দর জবাব দেয়ঃ সামাল দেয়া যাচ্চে নি।

ঃ কি ?

ঃ মাছ উঠতিচে—

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ গঙ্গা মাই কী জয়—

দূর থেকে ঘনাইর গলা শোনা যায়।

ঃ মোড়ল—

ঃ কে ?

ঃ আমি ঘনাই—

ঃ ক্যানে ?

ঃ আকাশটা দেখেচিস ?

রাঘব আকাশের দিকে তাকায়। উত্তর-পুব কোণ থেকে জমাট-বাঁধা ঘন কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে আকাশটাকে গিলবার জন্যে যেন এগিয়ে আসছে।

রাঘব বললেঃ ও কিছু লয়—

ঘনাই চেঁচিয়ে বলেঃ আওয়াজ পাচ্চিস নি ?

ঃ ঢেউ ভাঙতিচে—

ঃ ঢেউ লয়, ঢেউ লয়। ঝড়—

রাঘব কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। ওটা যে ঢেউএর শব্দ নয়, ঝড়ের শব্দ—তা রাঘব ভালো ভাবেই জানতে পেরেছিল। কিন্তু মাছ ধরতে এসে কিছু মাছ না ধরে ফিরে যাওয়া তার স্বভাব নয়। সবাই কিছু কিছু ধরেছে, কিন্তু তার জালে এখনো যে একটাও ওঠে নি।

বুলান ডাকেঃ বাপ্—

ঃ ক্যানে ?

ঃ শিগ্গির ধর্—

: কি ?

: উঠেচে—

হুঁকো-কল্‌কে নামিয়ে রেখে রাঘব জালে হাত লাগায়। সমস্ত জালটা ভরে গেছে। জাল সামলানো দায় হয়ে উঠেচে। সত্যি, সুন্দর মিথ্যে বলে নি : সামাল দেওয়া যাচ্চে নি—

হু হু শব্দে ঝড় এগিয়ে আসছে।

ঘনাই চেঁচিয়ে উঠলো : মোড়ল, অবস্থা মোটেই ভালো লয়। ফিরে চল্ সোব্—

রাঘব রেগে বলে ওঠে : যা তোরা সোব্। আমার জালে মাছ ভিড়তিচে। তোরা যা—আমরা পরে যাচ্চি।

: আমরা যাচ্চি তা'লে। তুই একদম দেরি করিস নি মোড়ল। আকাশটা আজ তেমন সুবিধের লয়—

: যা—

রাঘব ওদের যেতে বললো বটে, কিন্তু খুশি মনে বলতে পারে নি। আর একটু দেরি করলে কি এমন বিপদ হতো ওদের ? সত্যিই তো, ওদের জালে মাছ উঠেছে, ওরা আর তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে কেন ?

ওরা ফিরে যাচ্ছে। দাঁড় আর ঢেউ এর ছপ্ ছপ্ শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। দূরে হু হু শব্দের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল ডিঙির শব্দগুলো।

: একটু তাড়াতাড়ি কর, বুলান। আকাশের গতিক ভালো লয়—

: তুই বাপ্ এটা ধর। আমি আর একটা—

: আমি এই দুটো, ফের দুটো। তুই যা পারিস্, তোল্—

: বাপ্। যা হয়েচে, হয়েচে। এবার চল্—

: আর কয়েকটা। এ রকম আর কুনোদিন হবেনি রে—

একটু থেমে রাঘব বলে : ডর পাচ্চিস নি কি ? সমুদ্দুরই তো

জেলেদের ঘর, সমুদ্দুরই জমিন, আর এই মাছ হচ্চে ফসল—বুঝলি নি ?

কথাটা বুলানের মনঃপূত হলো কিনা বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলেঃ বাপ্। আওয়াজটা যে জোর হচ্চে—আর লয়। চল্ এবার—

ঃ আর দুটা—

কথাটা শেষ করতে পারেনি রাঘব। কথা শেষ হবার আগেই হুহু করে ঝড় ছুটে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় করে উঠলো সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ ঢেউ। আছাড় খেয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, আবার ফুঁসে উঠছে। তাদের ডিঙিটা কোন্ উঁচুতে উঠে গিয়ে আবার কোন্ গভীরে নেমে যাচ্ছে। প্রাণপণে শক্ত করে রাঘব হালটাকে ধরে সামাল দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঢেউগুলো সামান্য খড়কুটোর মতো ডিঙিটাকে এলোমেলোভাবে আছাড় মারতে লাগলো। রাঘব চিৎকার করে উঠলোঃ বুলান, গেল গেল। আর পারতেচি নি—ইদিকে আয়। সঙ্গে ধর একটু।

বুলান হালের দিকে আর এগোতে পারে নি। ডিঙিটা চোখের নিমেষে উল্টিয়ে গেল। সমুদ্র মাছগুলো সব ফিরিয়ে নিল।

ঃ বুলান—

ঃ আমি ধরে আছি, বাপ্—

ঃ সোজা কর্—

ডিঙিটাকে ওদের আর সোজা করতে হলো না। একটা ঢেউতে ডিঙিটা হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। কিন্তু পরের ঢেউটাকে আর ডিঙিটা সহ্য করতে পারলো না। জল ভরে গেল। এক নিমেষে ওটা তলিয়ে গেল। হ্যাঁ, সমুদ্র রাঘবের ডিঙিটাকে গিলে খেল। রাঘব চিৎকার করে উঠলোঃ বুলান—

তারপর আবার একটা ঢেউ। ঢেউএর অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

ঃ বুলান—

আবার একটা ঢেউ। তার দাপটে রাঘব কোথায় তলিয়ে যায়। প্রাণপণে জল আঁকড়ে আবার সে ভেসে ওঠে। বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকে ঃ বুলান—

বুলানের সাড়া আর রাঘব পায় নি। সামনে শুধু ঢেউএর লুটোপুটি। শুধু সমুদ্রের উন্মত্ত তাণ্ডব। ঢেউএর হাহাকারের মধ্যে তার ডাক আর শোনা গেল না। আকাশে তখন ছিল ঘন পুরু মেঘের দুরন্ত ছুটোছুটি, বাতাসে উন্মত্ত ঝড় আর বড়ো বড়ো ফোঁটায় প্রবল বৃষ্টি!

কী ভুলই সেদিন রাঘব করেছিল! জীবনে এতবড় ভুল সে কখনো করেনি। ঘনাইর কথামতো সে যদি তাদের সঙ্গে ফিরে আসতো, তাহলে হয়তো সে সেই দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেত। কী নেশাই যে তাকে সেদিন পেয়েছিল! সেদিনের মতো এতো মাছ সে ধরেনি কোনদিন।

ঢেউয়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করতে করতে সে হাঁপিয়ে পড়ছিল ক্রমাগত। অবশ হাতে জল টানতে গিয়ে সে জলের নিচে তলিয়ে গেছে, ঢেউ কাটাতে গিয়ে ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে সে হাঁসফাঁস করে উঠেছে। সেদিন প্রতি মুহূর্তে সমুদ্র তাকে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। আর সে প্রাণপণে ভেসে থেকে বুক ভরে বাতাস টেনে নেবার চেষ্টা করেছে শুধু।

কখনো বুক-সাঁতারে, কখনো ডুব-সাঁতারে সে এগিয়েছে। কিছুমাত্র সম্বল ছিল না হাতে; না এক টুকরো কাঠ, না এক গাছি বাঁশ। খালি হাতেই সে ঢেউএর পর ঢেউ ডিঙিয়ে ভেসে এসেছে।

একটা ভয় ছিল। সে কোনদিকে যাচ্ছে, তা জানবার কোন উপায় ছিল না। যদি সে মাঝ-দরিয়ায় চলে যায়। যায় যাবে, তবু কিছুতেই থামবে না সে। থামা মানেই মৃত্যু।

ভোরের দিকে ঝড় থামলো। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। অন্ধকার সরিয়ে পুব আকাশে সরু একফালি চাঁদও উঠে এলো। আর

দূরে স্বপ্নের মতো তীরের রেখাও দেখা গেল। ভয় সরে গিয়ে বুকে ভরসা পেল সে।

কিন্তু বুলান? বুলান কোথায় গেল? বুলান ডাঙায় উঠতে পারবে তো? যদি উঠতে না পারে? যদি সে কোনদিন না ওঠে? সে কোন্ মুখ নিয়ে ময়না বউর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? গত বোশেখে তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র। তিন মাসও পূরো হয়নি। ময়না বউ যখন তাকে বলবেঃ তুই ফিরে এলি। ও কুথায়? সোব্বাই তোরা ফিরে এলি। ওকে কুথায় রেখে এলি?

কি বলবে সে? কি জবাব দেবে রাঘব দলুই? জবাব নেই। তার চেয়ে এই ঢেউএর নিচে তার চিরদিনের মতো তলিয়ে যাওয়া ভালো। বুলান নেই। তার বড়ো ছেলে বুলান নেই। একথা ভাবতেই তার বুকের ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছিল সেদিন। জানে আশা নেই, তবু ক্লান্ত স্বরে সে চিৎকার করে ডাকেঃ বুলান—

পায়ের কাছে পিছল লাগলো কি? তবে কি বুলান? কিন্তু এতো পিছল কেন? মানুষের শরীর তো এতো পিছল হয় না। নিশ্চয়ই হাঙর পিছু নিয়েছে তার। তাহলে তো আর রক্ষে নেই। আবার পিছল কি একটা তার পায়ে এসে লাগলো। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে সে ওটাকে লাথি ছুঁড়ে মারলো।

লাথিটা ঠিক লেগেছে। কিন্তু পা-টা হঠাৎ এ রকম অসাড় হয়ে আসছে কেন? কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণা ধীরে ধীরে তার ডান পা থেকে যেন ওপরের দিকে উঠে আসছে।

অসহ্য সে যন্ত্রণা!

সমুদ্র বিষ-কামড় দিয়েছে তার পায়ে। দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে সে।

—শত্তুর, শালা শত্তুর—

তখনও সকাল হয়নি। রাঘব পায়ের তলায় ডাঙা খুঁজে পেল। বালি হাতড়াতে হাতড়াতে চরের উপর উঠে এসে বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

তারপর কি হয়েছিল আর কিছুই মনে পড়ে না তার।

না, আর কিছুই মনে পড়ে না রাঘব দলুইর।

তারপর চার মাস ছিল সে সরকারী হাসপাতালে। তারপর ছুটি হলো তার। কিন্তু তার গোড়ালি পর্যন্ত যে হাঙরে খেয়েছিল, সুদে-উসুলে তাকে আরো অনেক বেশি দিতে হলো। পা পচতে সুরু করায় ডাক্তারেরা পরামর্শ করে তার হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিয়ে দেওয়া সমাচীন মনে করে। চার মাস পরে যেদিন তার ছুটি হলো, সেদিন ডাক্তারদের পায়ের ধুলো নিয়ে একটা মোটা লাঠি সম্বল করে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরে এলো। মংলা আর বুধিয়া তাকে ধরে ধরে বাড়ি নিয়ে আসতে চেয়েছিল। সে তাদের ধরতে দেয় নি।

লাঠিতে ভর দিয়ে সে একাই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু মনের কোণে একটা ভয় জমাট বেঁধে ছিল। মংলাকে তাই সে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল : কুনো খবর পেয়েচিস্ ?

: না—

বুলানের কোন খবর তাহলে নেই। কোন্ মুখে সে ময়না বউর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ?

ময়না বউ সেদিন তার সামনে যথারীতি এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কোন কথা সে বলে নি। সে কথা বললে বরং ভালো ছিল। তার কোন কথা না-বলাই রাঘবের কাছে দুঃসহ লাগলো। মনে আছে, দাওয়ায় বসে পড়ে রাঘব জল খেতে চেয়েছিল। ময়না বউ অবিচল ভাবে জলের ঘটি হাতে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। গলায় জলটুকু ঢেলে নিয়ে সে ডাকে : বউ, ইদিকে আয়—

ময়না বউ কাছে এসে তেমনি অবিচল ভাবে দাঁড়ালো।

: আমি তোকে বলছি, বউ, ও ফিরে আসবে। বুলান আবার ফিরে আসবে—

ময়না বউর মুখে কোন কথা নেই। শুধু তার দুচোখ নিঙড়ে দুটি জলের ধারা নিঃশব্দে নেমে এসেছিল।

রাঘব দলুইর চোখের সামনে দিয়ে সমুদ্রের অনেকগুলো ঢেউ বয়ে গেল।

জালের গিঁট ফেরাতে ফেরাতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার। পেছন ফিরে তাকালো। না, কেউ নেই।

ময়না বউ সমুদ্রে স্নান করতে গেছে। এখনো ফেরে নি। ভোরে মংলা আর বুধিয়া ডিঙি নিয়ে মাঝ-দরিয়ায় মাছ ধরতে চলে গেছে। মাথার ওপর সূর্য হেলে পড়লে জোয়ার আসবে, তারাও ফিরবে।

রাঘব এখন ঘরের দাওয়ায় বসে ঘর আগ্‌লাবে আর মুরগী-গুলোকে চোখে চোখে রাখবে। ময়না বউ ফিরলে সে জাল আর সুতো তুলে রেখে দেবে। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে সমুদ্রের চরে চরে ঘুরে বেড়াবে। তার কি বসে থাকলে চলে?

বারো বছর ধরে সে সমুদ্রের চরে একভাবে ঘুরেছে। বারো বছর ধরে একনাগাড়ে সে বুলানকে খুঁজেছে।

সে জানে, সমুদ্র কিছুই গ্রহণ করে না। সবই ফিরিয়ে দেয়। তবে সমুদ্র বুলানকে ফিরিয়ে দিল না কেন? বুলানের একগাছি চুল কিংবা এক টুকরো হাড়—সমুদ্র কিছুই ফিরিয়ে দেয় নি। সমুদ্র তাহলে সবটাই খেল?

সমুদ্রকে সেই থেকে রাঘব বিশ্বাস করে না। ঘৃণা করে। মনে করে, সমুদ্র তার পরম শত্রু। চরের ওপর ঘুরতে গিয়ে কোন ঢেউ তার পা ছুঁলে সে সমুদ্রকে ক্ষমা করে না। বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাঠির বাড়ি মারতে থাকে ঢেউএর মাথায়।

একদিন হঠাৎ একটা ঢেউ এসে তার পায়ের কাছে ভেঙে পড়লো। অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠলো তার শিরার রক্ত। পাগলের মতো সে লাঠির বাড়ি মেরে চললো ঢেউয়ের মাথায়। ঢেউ চলে গেল মার খেয়ে। কিন্তু তখনও রাঘবের রাগ পড়ে নি। চোখ পাকিয়ে হাতে লাঠি বাগিয়ে ধরে সে অপেক্ষা করে থাকে পরের ঢেউটার। পরের ঢেউটা এলো। ঢেউটা বেশ বড়ো ছিল। তখন জোয়ারের সময়। ঢেউএর মাথায় বাড়ি মারতেই ঢেউটা এগিয়ে এসে তাকে ফেলে দিল বালির ওপর। নাকে মুখে নোনাজল ভরে দিয়ে ঢেউটা সরে পড়লো। রাঘব লাঠি ধরে উঠে দাঁড়িয়ে যা মুখে আসে, তাই বলে গাল দিল। তারপর পেছন ফিরে লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলো।

সে হেরে গেল। সমুদ্রের কাছে সে হেরে গেল। সমুদ্র তার ছেলেটাকে খেয়েছে। আবার গায়ের জোরে তাকেও হারিয়ে দিল। সে তো কোন দোষ করে নি। তবু সমুদ্রের কেন এই শয়তানি?

ঃ শালার জাতই খারাপ। তা নইলে এত জল থাকতে তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও কেউ ওর জল ছোঁয় না—

পেছন ফিরে দেখলো, আবার একটা ঢেউ আসছে। সে তেড়ে গিয়ে হাতে লাঠি বাগিয়ে ধরতেই ঢেউটাও পিছু হটে গেল।

ঃ দুয়ো, দুয়ো—

সমুদ্র ভয় পেয়েছে।

কিন্তু রাঘব জানে, সমুদ্রের শয়তানির সঙ্গে সে পেরে উঠবে না। তবু যদি তার আর একখানা পা-র পূরোটা থাকতো, তাহলে সে একবার ভালো করে চেষ্টা করে দেখতো।

সমুদ্র তার বড়ো ছেলেকে খেয়েছে, আর খেয়েছে তার ডান পায়ের আধখানা। তাকে সারা জীবনের মতো একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে।

সমুদ্রের সঙ্গে সে লড়বে কি করে? সমুদ্র তার লাঠির বাড়িকেও ভয় করে না, তার চোখ-রাঙানিকেও ভয় করে না।

তবু তাকে লড়তে হবে। শত্রুকে ক্ষমা করা চলবে না।

খোঁড়া রাঘব আরো বৃদ্ধ হয়েছে। আজকাল তার ছেলেরাও তাকে ভয় করে না।

ছেলেদের সে বলে দিয়েছেঃ সমুদ্দুরকে শত্তুর বলে জানবি। 'গঙ্গা' নাম মুখেও আনবি নি।

তার কথা কি ছেলেরা শোনে? না মংলা, না বুধিয়া—কেউ শোনে না। গত দশহরার দিন গঙ্গা পূজোর জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছিল মাছমারি গাঁয়ের জেলেরা। সে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভাগিয়ে দিলে কি হয়? মংলা তাকে লুকিয়ে গঙ্গা পূজোর চাঁদা দিয়েছে। গঙ্গা পূজোর নাচে গানে সবাই গেছে।

ময়না বউও।

আজকাল আর কেউ তাকে মানে না। মানতেও আর চায় না। গাঁয়ের সবাই বলেঃ বুড়োর মাথা খারাবি হয়েচে।

বলবেই তো। তার মতো সর্বনাশ আর কারো তো হয়নি। হলে বুঝতে পারতো, কেন রাঘব দলুই এমন হয়ে গেছে। তাকে বাদ দিয়ে ঘনাই মণ্ডলকে গাঁয়ের নতুন মোড়ল করা হয়েছে। রাঘব দলুই এখন আর গাঁয়ের কেউ নয়।

ঘরেই মানে না তাকে, পরে মানবে কি?

আজ ভোরের ঘটনাটা মনে পড়তেই তার রাগ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

সবাই ভোরবেলায় মাঝ-দরিয়ায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষার ঢেউ গুনছে। পুব আকাশে লাল আলো ফেটে পড়ছিল। তখন রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাছেই।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়!

কয়েকটা ডিঙি ছেড়ে গেল।

সমুদ্রের এই জয়ধ্বনি রাঘব একবারেই সহ্য করতে পারেনা। দু'চোখে তার আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়। মংলা আর বুধিয়া তার পঙ্গু বাপের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। রাঘব গোল

গোল চোখ পাকিয়ে ওদের দিকে একবার তাকালো। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মংলা আর বুধিয়া পরের ঢেউটার অপেক্ষা করছে। লগি বাঁশ হাতে নিয়ে মংলা ডিঙির মাথায় উঠে যায়।

প্রতীক্ষার ঢেউ এলো।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়!

মংলা আর বুধিয়া চেঁচিয়ে উঠলো একসঙ্গে।

ডিঙিতে ঠেলা দিয়ে বুধিয়া ঢেউএর মুখে ডিঙিটাকে তুলে দিয়ে লাফিয়ে উঠলো গলুইর কাছটাতে।

তারপর দুভাইতে পঙ্গু অসহায় বাপের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

ডিঙি ভেসে চলে যাচ্ছে। রাঘব কিছুই করতে পারলো না। ছেলেরা তাকে আর মানে না। ছেলেরা তার শত্রুকে পূজো করে।

রাঘবের চোখে আগুন ঠিক্‌রে বেরোল। কিন্তু কিছুই করতে পারবে না সে। সে যে অক্ষম, অসহায়। সে বৃদ্ধ হয়েছে আজ, তার ওপর সমুদ্র তাকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে।

না, সে কিছুই করতে পারবে না। কিছুই করার ক্ষমতা নেই তার।

সবাই তাকে আজ বিদ্রূপ করে, কৃপা করে।

রাঘব দলুইকে আর কেউ মানে না।

ময়না বউও তাকে আর মানে না।

তার নিষেধ সত্ত্বেও ময়না বউ দশহরার দিন গঙ্গাপূজো দেখতে যায়, নাচ-গানে যোগ দেয়।

প্রথম কয়েকটা বছর সে অবশ্য গঙ্গা পূজোয়, কি অন্য কোথাও যায় নি। ঘর থেকেই বেরুতো না সে। কিন্তু তারপর সব ঠিক হয়ে গেছে। বুলানের মুখ তার মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে বোধ হয়।

[illegible] আজো সে মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা পরে।

তা তো পরবেই। বুলান যে মরেছে, তার তো কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে বারো বছর প্রতীক্ষা করাই ওদের রীতি।

এই বারো বছর ময়না বউ হাতে শাঁখা আর মাথায় সিঁদূর পরে এসেছে। কিন্তু রাঘব জানে, ময়না বউর হাতের শাঁখায়, কি মাথার সিঁদূরে বুলানের কোন স্মৃতি নেই।

এই বারো বছরে অজস্র ঢেউ এসে সব স্মৃতি মুছে নিয়ে গেছে। সেখানে আজ অন্য মুখ উঁকি মারছে! রাঘব কি কিছুই জানে না? সে সব জানে। কিছুই তার চোখ এড়ায় না।

মংলার ডিঙিতে ফেরার সময় হলে ময়না বউ খাবারের থালা আর জলের ঘটি নিয়ে চরে যাবার জন্যে এত উতলা হয়ে ওঠে কেন, তার দুচোখে কিসের মায়া ঘনিয়ে আসে,—রাঘব কি তা জানে না? তার অর্থ বোঝে না?

ময়না বউ আজ নতুন স্বপ্ন দেখছে। দেখুক। কিন্তু রাঘব ভুলবে না। বুলানকে তার সমুদ্র গিলে খেয়েছে, সে কথা সে জীবনেও ভুলবে না।

রাঘব মুখ তুলে তাকায়। ময়না বউ এখনো ফিরলো না? সে যতই বলেঃ সমুদ্দুরে যাস্ নি বউ, সমুদ্দুরে যাস্ নি তুই—

ময়না বউ কি শোনে তার কথা? সমুদ্রে স্নান না করলে যেন ময়না বউর স্নানই হয় না।

হঠাৎ মুরগীর চিৎকারে রাঘবের হাতের সূতোটা আবার ছিঁড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাতেই সে দেখতে পেল, শেয়ালে একটা মুরগীকে ধরেছে—ঠিক লাল ঝুঁটিটার নিচেই ঘাড়ের ওপর কামড়ে ধরে নিয়ে চলেছে। মুরগীটা চেঁচাচ্ছে, আর বাকি মুরগীগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে।

রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে দৌড়ে যায়, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে

হাতের লাঠিটাকে ছুঁড়ে মারে। শেয়ালের খুব কাছে গিয়ে লাঠিটা পড়তেই শেয়ালটা মুরগীটাকে ছেড়ে দিয়ে পালায়।

খানিকটা পথ গিয়ে শেয়ালটা কি ভেবে ফিরে তাকালো। মুরগীটা তখনও সেখানে পড়ে কাত্‌রাচ্ছে আর দেখলো রাঘবের হাতে লাঠি নেই, তাই সে তার খোঁড়া পায়ে তার দিকে আর এগোতেই পারছে না।

শেয়ালটা কি ভাবে। তারপর এক নিমেষে ফিরে এসে আবার মুরগীটাকে মুখে নিয়ে দৌড়ে পালায়।

রাঘব যে পঙ্গু এবং অক্ষম, শেয়ালটাও তা বুঝতে পেরেছে। দেখতে দেখতে কানাই ঢিবির পাশ দিয়ে, রাস্তার ধারে কংকালসার ডিঙিটার ওপর দিয়ে, নারকেল গাছের ছায়া মাড়িয়ে পলাশ বনের আড়ালে শেয়ালটা কোথায় লুকিয়ে পড়লো।

আর, লাঠিটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধ রাঘব দলুই রাগে দুঃখে ঠায় দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগলো।

আজ কাল আর কেউ তাকে মানে না। কেউ মানে না।

গজ গজ করতে করতে রাঘব জালের কাছে এসে বসে। জালে হাত দিতে তার আর ইচ্ছে করে না। ছেঁড়া সূতোয় গিঁট দিতেও তার হাত সরে না।

ময়না বউ এখনও ফিরলো না? আশ্চর্য! কতোক্ষণে যে স্নান হয় বউটার কে জানে? বউটা আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। বুড়ো বসে বসে মুরগীগুলোকে গোনে। এক....দুই....তিন....

ঃ মোড়ল ঘরে আচিস্ নিকি?

রাঘব ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। এমন ভাবে সে বসে আছে, দেখে মনে হয় যেন তার দুখানা পা-ই আস্ত রয়েছে।

মোড়ল বলে তাকে কে ডাকে? সে তো আর মাছমারি গাঁয়ের মোড়ল নেই। তবে?

এবার বুঝতে পেরেছে সে। ঘনাই মণ্ডল। নিজে মোড়ল হয়েছে কিনা তাই তাকে মোড়ল বলে ডেকে খানিকটা বিদ্রূপ করে মনে মনে আনন্দ পাচ্ছে সে। তা পাক। কিন্তু হাতে তার মরা মুরগীটা কেন ?

: এটা তোদের মুরগী লয় ? শিয়ালে লিয়ে যাচ্ছিল, আমি কেড়ে এনেচি—

হাসতে হাসতে ঘনাই বলে।

: আর আমি কেড়ে আনতে পারলাম নি। আমার সামনে দিয়ে মুরগীটাকে লিয়ে পালালো।

মনে মনে বললো রাঘব। ঘনাই যেন রাঘবের অক্ষমতা ও পঙ্গুত্বকে আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

: দেখলাম, এটা তোদেরই মুরগী। লিয়ে এলাম—

কিন্তু ঘনাই এত সহজে মুরগীটাকে ফেরৎ নিয়ে আসে নি।

সোলেমানপুর থেকে সূতো কিনে ঘরে ফেরবার পথে মুরগী নিয়ে শেয়ালটাকে পালাতে দেখে সে তাড়া করে গেল। আর মুরগীটাকে ফেলে রেখে শেয়াল পালিয়ে যেতেই সে মুরগীটাকে হাতে তুলে নিয়ে ভাবলো। প্রথমে ঠিক করলো, ঘরে নিয়ে গিয়ে রান্না করে ওটাকে খাবে। কিন্তু, পরে ভাবলো, শেয়ালে-খাওয়া মুরগী। যদি বিষ হয়ে যায়। তার চেয়ে রাঘব দলুইর মুরগী রাঘব দলুইকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। রাঘব তাহলে বুঝবে, ঘনাই মণ্ডলের মনটা কতো উঁচু। কিন্তু রাঘব মুখে কিছুই বললো না। মরা মুরগীটার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

ময়না বউ স্নান করে সারা গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ফিরে আসে। সে মরা মুরগীটাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল।

: একি ? মুরগীটাকে মারলো কে ?

ঘনাই হাসে এবং তার কৃতিত্বের কথা আর একবার সগর্বে ঘোষণা করে।

: আমিই কেড়ে লিয়ে—ফিরিয়ে লিয়ে এয়েচি।

মংলা সেদিন ওটাকে মেরে রান্না করে দিতে বলেছিল ময়না বউকে। কিন্তু ময়না বউ বারণ করেছিল ঃ আর একটু বড়ো হোক, তখন খাস্—

আজ মংলা ফিরে এসে হয়তো তাকে বলবে ঃ আমাকে খেতে দিলি নি, শিয়ালকে খাওয়ালি বউ—

আর বুধিয়া ভাত দেবার সময় বলবে ঃ একটা কমিয়ে দিলি, বউ ?

বুড়ো মুখ ফুটে কিছু 'বলবে না। কিন্তু মনে মনে ঠিক গজ গজ করবে রাগে। বুড়োকে তো সে চেনে।

ঘনাই বসে পড়লো মাটিতে।

রাঘব বলে ঃ একটা পিঁড়ি দিয়ে যা, বউ।

মোড়লের মান রাখতে হবে তো। পিঁড়ি দেওয়া চাই। তামুক দেওয়া চাই।

ময়না বউ পিঁড়ি দিয়ে গেল।

ঃ তামুক খাবি নিকি ঘনাই ?

ময়না বউর দিকে তাকিয়ে ঘনাই বলে ঃ খাবো—

নারকেল গাছগুলো ঈষৎ-তেরচা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়াগুলো ঝিলমিল করে কাঁপছে।

ঃ সত্যি মোড়ল, সে দিনের কথা মনে হলে গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। মোষের পিঠে কাক বসলে ওকে তাড়াবার জন্যে মোষের পিঠটা যেমন করে ওঠে, রাঘবের সারা গা-টা যেন তেমনি করে উঠলো। রাঘব ঘনাইর মুখের দিকে তাকালো। ঘনাইরও বয়েস বেড়েছে। তারও মাথায় চুল পাকতে সুরু করেছে। ঘনাইও কি তার মতো সে দিনের সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা ভাবে ?

ঃ তোর মনে আছে ঘনাই ?

ঃ সোব্ মনে আছে। পলাশ বনের মাথার ওপর এমন সিঁদুরে মেঘ আর কুনোদিন দেখেচিস্ তুই ?

আবার রাঘবের সারা গা শিউরে উঠলো। মাথা নাড়লো সে। না, সে তা কখনো দেখেনি।

ঃ সোকালে তোকে যখন চরের উপর পাওয়া গেল, তখন পুব দিকে তেমনি আলো, তেমনি লাল। সমুদ্দুরের জলও লালে লাল।

রাঘবের কাটা পা-টা যেন আবার ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে।

ময়না বউ ফুঁ দিতে দিতে তামুক দিয়ে গেল।

হুঁকোয় কয়েক টান দিয়ে ঘনাই বলেঃ দেখতে দেখতে বারোটা বছর পার হয়ে গেল।

ময়না বউ চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কি কথা হচ্ছে দুই মোড়লের মধ্যে? কার কথা? একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘরের ভেতর চলে যায়।

রাঘব বলেঃ এখনো তিনমাস বাকি—

হুঁকো নামিয়ে ঘনাই বলেঃ তোর কি মনে হয়? ফিরবে?

ঃ ফিরতেও তো পারে—

ঃ বারো বছর কেটে গেল, ফিরলো নি যখন, তখন তিনমাসে—

ঃ কিছুই পাওয়া যায় নি যখন, তখন তিনমাস তো—

ঃ হুঁ, তা ঠিক। তবে আমি বলতেচিলাম কি? বউটাকে আর—

ঃ কি?

ঃ কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

ঃ ক্যানে?

ঃ বারো বছর বাদে বিয়ে যখন দেওয়া যায়, তখন—

রাঘব চুপ করে থাকে। বালিয়াড়ির ওপারে সমুদ্র ঢেউ ভাঙলো। নারকেল গাছের ছায়াটা আবার শি র্ শির্ করে কেঁপে উঠলো।

ঃ মংলারও তো তুই বিয়ে দিস্ নি। তাই গাঁয়ের সোব্বাই বলাবলি করচিল কি যে—

ঃ ঘনাই—

রাঘবের গলায় ধমকের সুর।

ঃ ক্যানে? সে রীতি তো আমাদের আছেই। ঝগড়ু করেছে, ঠোগ্রা করেচে। মাছমারি গাঁয়ে এতো লতুন লয় কথাটা—

ঃ হুঁ। আজকাল মাছমারি গাঁয়ের মোড়ল হয়েচিস্ তুই। কিন্তুক আমার ঘরে মোড়লি করতে আসিস্ নি, বুঝলি? আমার বংশে উসোব্ নাই—

ঘনাইর মানে ঘা লেগেছে। সে এবার ফুঁসে ওঠে ঃ অ—এ সোব্ তোর বংশে নাই। কিন্তুক অন্য সোব্ আছে—

ইংগিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহলে তার ঘরের খবর অনেকদূর ছড়িয়ে গেছে। গাঁয়ের কারুর কাছে বোধ হয় কিছু গোপন নেই। রাঘব মনের কথা চেপে শান্তভাবে বলে ঃ কিন্তুক যদি বুলান ফিরে আসে—

ঃ আসে তো ভালোই। আমি এখন যাই। আমার কথা আমি তোকে বলে গেলাম। আমার কথা হচ্চে মাছমারি গাঁয়ের কথা। বুঝলি নি?

ঃ বুঝেচি। কিন্তুক এ সোব্ আমার বংশে নাই—

ঃ গাঁয় তো আছে—

ঘনাই চলে যাচ্ছিল। রাঘব ডেকে বলে ঃ মুরগীটা লিয়ে যা—

ঃ শেয়ালে-খাওয়া মুরগী ঘনাই মোড়ল খায় না।

ঃ সেই জন্যে তুই ফিরিয়ে লিয়ে এয়েচিলি? অ ঘনাই—

ঘনাই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর রাঘব এক আশ্চর্য হাসিতে ফেটে পড়ে।

হাসি শুনে ময়না বউ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

ঃ হাস্‌চিস্ ক্যানে?

রাঘবের হাসি তবু থামে না।

ঃ কি হয়েচে?

হাসি থামিয়ে রাঘব বলেঃ মুরগীটাকে বেশ করে নুন-লঙ্কা দিয়ে রান্না কর দি নি—

ময়না বউ মুরগীটাকে নিয়ে চলে যায়। রাঘব বসে থাকে আর নিজের মনে হাসে। ঘনাইকে আজ সে অপমান করেছে। প্রাণ ভরে অপমান করেছে।

নারকেল গাছের ছায়াগুলো গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে। বেলা বাড়ছে ক্রমাগত। রাঘব মুখ তুলে তাকায়। পলাশ বনের মাথায় আগুন জ্বলছে।

এটা বোশেখ মাস।

পলাশ বনে আগুন জ্বলবার সময়। দুদিন বাদে এ আগুন নিভে যাবে। উতলা পলাশ বন শান্ত হয়ে যাবে।

হঠাৎ তার ময়না বউর কথা মনে পড়ে যায়। দুদিন বাদে ময়না বউও পলাশ বনের মতো শান্ত হয়ে যাবে।

জোয়ারের জলে সমুদ্রের চরটা ভরে গেছে।

সারা সকাল যে চরটা ধূ ধূ বালির রিক্ততা নিয়ে পড়েছিল এখন তাকে চেনাই যায় না। শরীরে থই থই করে যৌবন দুলছে। ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে চরের ওপর। বালির চরটা এক নতুন আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

লোকজনের ভিড় বাড়তে স্রুরু করেছে চরের ওপর। মাছমারি গাঁয়ের লোকেরা এসেছে। সঙ্গে এসেছে কিছু খাবার, কিছুটা মিঠে জল।

আর এসেছে দূর দূরান্ত থেকে বেপারিরা। কারো কাঁধে ঝুড়ি-সাজানো বাঁক, কারো মাথায় ঝাঁকা। দুপুর না হতেই তারা এসে চরের ওপর ভিড় জমিয়ে ফেলে। ডিঙিগুলো একে একে ফিরে এলে ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে কি মাছ এনেছে দেখবার জন্যে। তারপর যে-যার পছন্দসই মাছের ওপর কিছুক্ষণ করবে দর কষাকষি। মাছ কেনা হয়ে গেলে ডিঙির মাছ উঠবে ঝাঁকায় আর ঝুড়িতে।

তারপর পুরুষেরা কাঁধে তুলে নেবে বাঁক। মেয়ে-বেপারিরা মাথায় তুলে নেবে ঝাঁকা। এক নিমেষে তারা দৌড়ে বালিয়াড়ি পেরিয়ে ভেড়ি বাঁধের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাছ নিয়ে কেউ যাবে গ্রামের

বাড়ি বাড়ি, কেউ যাবে হাটে বাজারে। আজকাল আবার মাইল পাঁচ-ছয় দূরে পাকা সড়কের ওপর বেপারিদের কাছ থেকে মাছ কেনবার জন্যে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। মাছ নিয়ে ট্রাকটা ধুলো উড়িয়ে শহরের পথে ছুটে যায়।

আজও সমুদ্রের চরে বেপারিরা ভিড় জমিয়েছে। আর এসেছে মৈনি মাসি—ওই নামেই সবাই তাকে ডাকে। যখন বয়সে তেজ ছিল, তখন থেকেই সে মাছের কারবার করে আসছে। দু টাকার মাছ একটাকায় কেনার জুড়ি তার মতো কেউ নেই।

এখনও সে কস্তা পেড়ে শাড়ি পরে, গায়ে দুএকখানা সোনার গয়নাও তার আছে। হাতে পানের কৌটো।

মৈনি মাসি বোধহয় ভাত খায় না, শুধু পানই খায়। ঠোঁটে তার সারাক্ষণ পানের দাগ লেগেই থাকে।

মৈনি মাসিকে সবাই ভয় করে। বেপারিরা তো বটেই। মাছমারির জেলেরাও। পুরোনো খদ্দের বলে তার মানই আলাদা।

একে একে ডিঙিগুলো ফিরে আসছে। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বেপারিরা ডিঙিটাকে এক নিমেষে ঘিরে ফেলছে। তারপর দর হাঁকাহাঁকি, হট্টগোল।

মংলাদের ডিঙি এখনও ফেরেনি। ময়না বউ জল আর খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে যতদূর চোখ চলে, সে তাকায়। কালো কালো কয়েকটা বিন্দু বড়ো হতে হতে এগিয়ে আসছে। ওই কালো বিন্দুগুলোর কোন একটাতে মংলা আছে, বুধিয়া আছে।

বিন্দুগুলো ডিঙির আকার নিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে আসছে। লোকগুলোর চেহারাও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ওই তো ওইটাতে মংলা আর বুধিয়া। ময়না বউর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মংলাও হাসতে থাকে।

ডিঙি এসে চরে ভিড়লো।

ময়না বউ খাবার আর জলের ঘটি নিয়ে এগিয়ে যায়। জলের

ঢেউএ তার হাঁটু পর্যন্ত কাপড় ভিজে পায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে যায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। মংলা ডিঙি থেকে হাত বাড়িয়ে জলের ঘটিটা ধরে নেয়।

ঃ বড্‌ডো তেষ্টা পেয়েচে রে—

ঃ না, খাবারটা আগে খেয়ে লে।

ময়না বউর হাত থেকে দুভাই খাবার আর জল নিয়ে খায়।

ততক্ষণে ডিঙির চারদিকে ভিড় জমে উঠেছে। বুধিয়ার হাত থেকে জলের ঘটিটা ধরে নিয়ে ময়না বউ ফিরে আসবে, এমন সময় প্রায় তার ঘাড়ের ওপর থেকেই শোনা যায়ঃ সর্‌তো দেখি। ওঃ—তোদের জ্বালায় আর মাছ কেনা যাবে না। বেপার ছেড়েই দিতে হবে। বাপ্‌রে বাপ্‌—

ময়না বউ মৈনিমাসির দিকে একবার কট্‌মট্‌ করে তাকায়। তারপর কিছু না বলে চরের ওপর উঠে আসে।

মৈনিমাসি। মাছমারি গাঁয়ের বুড়োরা বলেঃ মৈনি লয়, মৈনি লয়। মোহিনি—

ও যার ডিঙিতে ভিড়বে, সেদিন তার কপালে ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু নেই। কথায় কেউ পারবে না মৈনিমাসির সঙ্গে। মৈনিমাসি যখন কথা বলে, তখন তার মুখে যেন খই ফুটতে থাকে। দু টাকার মাছ এক টাকায় যায় বিকিয়ে। তার মুখের ওপর কথা বলে, এমন সাহস কারো নেই। না জেলেদের, না বেপারিদের। সে যখন দর কষাকষি করে, তখন যাদ কোন বেপারি তার ওপর কথা বলে ফেলে, তাহলে তার আর রক্ষে নেই। রইলো পড়ে মাছ-কেনা, রইলো পড়ে ঘরে-ফেরা। সেই বেপারির সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করে তবে সে ছাড়বে।

সেই মৈনিমাসি আজ মংলার ডিঙিতে ভিড়েছে। আজ সেরা মাছ ধরেছে মংলা। আশা ছিল, বেশ কিছু হাতে আসবে। কিন্তু তা আর হলো না।

ছোঁ মেরে এসে মৈনিমাসি ধরলো ডিঙিটাকে। তার ভয়ে অন্য

বেপারিরাও ভিড়তে সাহস পেল না। অনেক দর কষাকষির পর জলের দামে মাছগুলোকে বিক্রী করতে হলো মংলাকে।

ইস্, কি লোকসানটাই তার হলো আজ। সত্যি, আজ কপাল তার বড়ো মন্দ।

মাছগুলো মৈনিমাসির ঝুড়িতে তুলে দিতে কষ্ট হচ্ছিল মংলার। কিন্তু উপায় নেই। মৈনিমাসির খপ্পর থেকে কেউ কোনদিন রেহাই পায় নি। সেও আজ পেল না। মাছগুলো তুলে দিয়ে মংলা আর বুধিয়া ডিঙিটাকে ঠেলে বালির ওপরে নিয়ে এলো। তারপর জালের বাঁশটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দুভাই ফিরে চলে ঘরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ময়না বউও চলতে থাকে।

ঃ জানিস বউ, বড্‌ডো ক্ষেতি হয়ে গেল আজ।

ঃ ওকে মাছ দিলি ক্যানে ?

ময়না বউর গলার ঝাঁঝ মাথার ওপরের রোদ্দুরের তাতের মতোই। বোশেখের রোদ্দুরে পুড়ে পায়ের তলার বালিগুলো আগুনের মতো তেতে উঠেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল ময়না বউর।

ঃ তুই ওকে এদ্দিন দেখছিস, এখনও চিনতে পারলি নি। মাছ না লিয়ে ও আমাকে আজ ছাড়তো কিনা। ওর নাম মৈনিমাসি—

ঃ মোহিনি লয়, মোহিনি লয়—

ঃ তবে কি ?

ঃ ডাইনি—

সূর্য বিকেলের আকাশে গা এলিয়ে দিয়েছে। রোদের তাতও একটু কমেছে। দক্ষিণের ঝিরঝিরে বাতাসে নারকেল-পাতার ঝালর কাঁপছে, পলাশ বনের মাথায় বিকেলের রোদ্দুর কাঁপছে টলমল করে।

বালিয়াড়ির দক্ষিণে সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। বালিয়াড়ির গায়ে রোদ্দুর বিছিয়ে আছে এক গভীর ভালোবাসার মতো।

রাঘব কখন বেরিয়ে গেছে, কেউ জানেনা। দাওয়ায় একখানা

ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুক্‌নো পানা-ভরা একটা তেল-কুচকুচ বালিশে মাথা রেখে এতক্ষণ সে উঠোনের নারকেল গাছগুলোর মতো ঝিমোচ্ছিলো।

বিকেল হতেই মাদুর আর বালিশটাকে ওপরের চালার কোলে তুলে রেখে সে কাঠকয়লা ধরিয়ে তামাক খেল। তামাক টানার শব্দে বিকেল আরো গড়িয়ে যায়। পলাশ বনের ঘনীভূত রহস্যের ভেতর থেকে একটা কোকিল ডেকে ওঠে। পলাশ বনের আত্মা যেন গান গেয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গাঁ-টা শিউরে উঠছে এক অবাক খুশিতে।

রাঘব আর বসে থাকতে পারলো না। তার যে অনেক কাজ। তার কি বসে থাকার সময় আছে?

সে এখন সমুদ্রের চরে যাবে। সমুদ্রের চরে চরে কি যেন খুঁজে খুঁজে ফিরবে সন্ধে পর্যন্ত। তারপর ঢেউকে কখনো মারবে লাঠির বাড়ি, কখনো চোখ মুখ পাকিয়ে সমুদ্রের বাপান্ত করবে। তারপর রাত নামলে মুখ শুকিয়ে ঘরে ফিরে আসবে।

বিকেল হতেই রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে কখন যে চলে গেছে, কেউ জানতে পারে নি।

রাঘবের পর বুধিয়া। বুধিয়ার একটি নেশা আছে। তা হলো বাঁশি-বাজানো। বিকেলের রোদ্দুরে রং ধরতে না ধরতেই সে বাঁশিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাঁশিটাকে সে যতখানি ভালোবাসে, ততখানি বোধহয় সে নিজেকেও বাসে না। বাঁশি বাজাতে বসলে সব ভুল হয়ে যায় তার। সে সব ভুলে যায়। ঘরে-ফেরার কথা, মুরগী-ডাকার কথা—না, কিছুই তার মনে থাকে না। ঘরে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় এক একদিন। ময়না বউ খ্যাঁক্ করে ওঠে ঃ অত দেরি করলে ভাতের হাঁড়ি লিয়ে কে বসে থাকবে রে তোর জন্যে? ক টা বউ আছে রে তোর—

উত্তরে বুধিয়া শুধু হাসতে থাকে।

ময়না বউ আরো রেগে যায় ঃ হাসচিস, লজ্জা করচে নি তোর। একদিন তোর বাঁশিটা ভেঙে উনুন ধরিয়ে দিব। হ্যাঁ—

জিভ কাটে বুধিয়া।

: অমন কাজ কক্খনো করিস নি বউ। তা'লে ঠিক মরে যাবো।

রাগে আরো বক বক করতে থাকে ময়না বউ।

: খেয়ে লিবি চ'—

আজ বুধিয়াও বাঁশি হাতে বেরিয়ে গেল। কখন ফিরবে, কে জানে?

দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়েছিল মংলা। ঘুমিয়েছিল কি না কে জানে? পলাশ বনের কোকিলের ডাক আর নারকেল পাতার ঝালরের শব্দে সে উঠে পড়লো। কি ভেবে তাকালো এদিক ওদিক। রোদ্দুরের রং বদ্‌লেছে, গাছের ছায়াগুলো যেন আরো বড় হয়েছে; মনের ভেতরটা তার এক গাঢ় বেদনার মতো ঘন হয়ে উঠলো।

: বউ, অ বউ—

: ক্যানে?

ঘরের ভেতর থেকে ময়না বউর গলা ভেসে আসে।

: শুন্, শুনে যা—

: এখন যেতে পারবো নি—

ময়না বউ আজ বিকেলের এই রোদ্দুরের রং বদ্‌লানো দেখতে পেল না। ময়না বউ এমন কি জরুরি কাজ করছে যে একটি বার বেরিয়ে আসতে পারছে না?

মনে মনে রাগ হয় মংলার। উঠে সে মাদুর আর বালিশটাকে তুলে রেখে দেয়। তারপর ময়না বউ কি করছে দেখবার জন্যে ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ায়।

মংলা নড়তে পারে না। একবার ভাবে সে চলে আসবে। কিন্তু পর মুহূর্তে তার পা ওঠে না। এক জায়গায় স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ময়না বউ তার ডান উরুতের ওপর কাপড় তুলে পল্‌তে পাকাচ্ছিল। মংলা সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ময়না বউর মসৃণ সুডোল উরুতের ওপর দিয়ে পল্‌তেটা গড়াতে গড়াতে উঠে যায়। মংলার চোখে পলক পড়ে না। সারা গায়ে কেমন একটা চোরা ঢেউ খেলে যায় তার।

খুলে খুলে যাচ্ছে পল্‌তেটা। পাক নিচ্ছে না কিছুতেই। যা মোটা কাপড়। তার ওপর জায়গাটা বড় বেশি মসৃণ। তাই বোধহয় বারে বারে পিছলে যাচ্ছে পল্‌তেটা।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ময়না বউ।

ঃ কি দেখ্‌চিস রে অমন করে চেয়ে চেয়ে? চোখে যেন তোর পলকই পড়চে না।

মংলার সারা শরীরটা শির শির করে ওঠে।

ঃ সত্যি, বড়ো সোন্দর—

ময়না বউ আবার হেসে ওঠে।

তার হাসিতে শব্দ হয় না। কিন্তু সারা দেহে ঢেউ খেলে যায়। এক চাপা আবেগে কানায় কানায় উপচে-পড়া শরীরটা তার দুলে দুলে উঠতে থাকে।

ঃ সোন্দর? কি সোন্দর রে?

ঃ তুই বড়ো সোন্দর, বউ—

আবার চাপা হাসিতে কাঁপতে থাকে ময়না বউর দেহটা।

ঃ সে কথা তুই এদ্দিন পরে জানতে পারলি? এদ্দিন তা'লে তুই ঘুমিয়ে ছিলিস, না চোখ বুজে ছিলিস্ রে?

ঃ কানা হয়ে ছিলাম রে বউ।

মংলা হাসতে থাকে।

ঃ অ, তাই বল্—

একটু থেমে ময়না বউ বলে ঃ আজ চোখ খুলে গেল তোর, লয়?

ময়না বউ হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

পল্‌তে পাকানো হয়ে গেলে নগ্ন উরুতের ওপর কাপড়টা ঢেকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ময়না বউ।

ঃ এখন আমার মনে একটা বাসনা হয়। কি বাসনা জানিস্ বউ ?

ঃ কি ?

ময়না বউর ধনুকের মতো বাঁকা দুটি ভুরুর নিচে আসন্ন সন্ধের ঘনায়মান রহস্য দুলে ওঠে।

ঃ তোকে লিয়ে এক্‌খুনি সমুদ্দুরের চরে ছুটে যাই—। যাবি বউ ? তোর সাথে সমুদ্দুরের জলে নাইবো, ঢেউ ভাঙবো। যাবি ?

মংলা কয়েক পা এগিয়ে যায়।

কেরোসিন-মাখা হাত দুটো তুলে হাসতে হাসতে ময়না বউ এগিয়ে আসে ঃ সরে যা। না'লে এই ডিপের তেল-মাখা হাতদুটো তোর মুখে ঘষে দিব। হ্যাঁ—

একদিকে একখানি মাত্র ঘর। বাকি তিনদিকে পাঁচিল। মাঝখানে উঠোন। উঠোনের মাঝখানে বড় একটা মাটির গামলায় জালে লাগাবার রং পচছে। একপাশে মুরগীর ঘর। অন্য পাশে ধানভানার ঢেঁকি পাতা।

চাল কেনাই ওদের অভ্যেস। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু ধানও ওরা কিনে রাখে। যখন চাল কিনতে মেলে না, তখন ধান সেদ্ধ করে, শুকিয়ে, ঢেঁকিতে করে ভেনে নেয় ওদের বৌ-ঝিরা।

উঠোনের রোদ্দুর পুব পাঁচিলের চাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। উঠোনে ছায়া জমছে পুরু হয়ে।

মংলা সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাইরের দাওয়ার দিকে।

ঃ কুথায় চলে যাচ্চিস তুই ? একটা কাজ কর দি'নি—

ময়না বউ যেন হুকুম করছে মংলাকে। কিন্তু ভেতরে চাপাহাসির ছোঁয়াচ্।

মংলা ভারি মুখে ফিরে তাকায় ঃ কি ?

তার দু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ময়না বউ।

ঃ অ, আমার কাছে বুঝি বেশিক্ষণ থাকতে ভালো লাগে না তোর ?

ঃ কি বল্‌চিস, বল্‌ না—

ঃ আমার কথার জবাবটা আগে দে।

ময়না বউ কাছে এগিয়ে আসে। দু চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে ঃ ভালো লাগে না, নারে ?

নারকেল গাছের পাতাগুলো ঝির ঝির করে উঠলো, শন্‌শন্‌ করে বাতাস বয়ে গেল ঘরের চালের ওপর দিয়ে। একটা দল-ছাড়া মুরগী ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে কক্‌ কক্‌ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে পালিয়ে গেল।

ঃ অ, তোর কথা শুনি নি বলে রাগ করেচিস ? তা অমন রাগ হওয়া ভালো।

একটু থেমে ময়না বউ বলে ঃ ভাব না হলে রাগ হয়না। আবার রাগ না হলে ভাব হয় না। লে, আয় দি'নি—

ঃ কুথায় ?

ঃ আমার সাথে ধান ভানবি আয়।

মংলা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

ঃ আমি পারবোনি, তুই ভেনে নিগে যা।

ঃ রাগ করচিস ক্যানে ? একা কি ধান ভানা যায় ? এঁ্যা ?

মংলার একটা হাত ধরে ময়না বউ সুর করে গাইতে আরম্ভ করে ঃ

দুয়ে না হৈলে ধান
ভানবো কেমন করি—
লাগর, বলে দে উপোসে পরাণ
বাঁচবে কেমন করি ?

হাসতে হাসতে টাল সাম্‌লাতে না পেরে ময়না বউ মাটিতে বসে পড়ে। মাটিতে বসেও সে হাসতে থাকে।

সত্যি, ময়না বউ যখন হাসে তখন সে সমস্ত শরীর দিয়েই হাসে। কী সুন্দরই না লাগে তখন তাকে দেখতে।

মংলা চোখ ফেরাতে পারে না।

ময়না বউ নিজেকে সাম্‌লাতে চেষ্টা করে। খাটো আটপৌরে

কাপড় খানা এদিকে ওদিকে সরে গিয়েছিল। হাত দিয়ে ঠিক করে নেয়। তারি মাঝে হাসির ঝড় সাম্‌লাতে গিয়ে দুলে দুলে উঠছে বারে বারে। দুহাতে মংলার হাত দুখানা চেপে ধরে সে বলেঃ তোল্‌, আমাকে টেনে তোল্‌ দি'নি। কিরে গায়ে জোর নেই তোর ?

মংলা তাকে টেনে তুলতেই সে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলেঃ চল্‌, ধান ভেনে দিবি, চল্‌। রাতে ভাতের চাল নাই।

ময়না বউ এমনিতে চুপচাপ। খুব ঠাণ্ডা মেয়েমানুষ। পাড়ায় এই নিয়ে তার সুনাম ও বদ্‌নাম—দুই আছে। কেউ সমবেদনার সুরে বলেঃ আহা, বেচারা বড়ো ঘা খেয়েছে। কথা বলবে কি ?

কেউ বলেঃ বউটা শুকিয়ে ম'লো। মুখে হাসিটি নেই।

যে কিছু বেশি জানে, সে বলেঃ থাকে ভিজে বিড়ালটি। কিন্তু ডুবে ডুবে জল খাবার গুরু। মংলার সাথে—হেঁ—

কিন্তু মংলা তো ময়না বউকে চেনে। বড়ো শক্ত মেয়েমানুষ। ও যখন হাসে, তখন প্রাণ ঢেলে হাসে। তখন মনেও হয় না যে জীবনে তার এতবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কাঁদতে তাকে কেউ কখনো দেখে নি। সেই যেদিন রাঘব হাসপাতাল থেকে কাটা-পা নিয়ে ফিরে এলো, সেদিনই সবাই ওকে একবার কাঁদতে দেখেছিল। তা-ও তাতে কোন চিৎকার ছিল না, কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। দু'গালে শুধু দুটি জলের রেখা এঁকে গিয়েছিল মাত্র।

তারপর কতবার সূর্য উঠেছে, সূর্য ডুবেছে। সমুদ্রের চরের ওপর কতো ঢেউ এসেছে, ফিরে গেছে। ময়না বউর চোখে আর জল আসে নি। বুলানের জন্যে সে একটিবারও বুক ফাটিয়ে কাঁদে নি।

সেই ভয়ানক আষাঢ় মাস কতোবার এসে ফিরে গেল। কিন্তু ময়না বউর চোখে এক ফোঁটা জলও ঝরাতে পারে নি।

মাছমারি গ্রাম ভেবেছিল, ময়না বউ বুক চাপড়ে, চিৎকার করে কাঁদবে। তাদের সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

ময়না বউর চোখের কোণ এই বারোটা বছরে আর একবারও ভিজলো না।

মংলা মাঝে মাঝে ভাবে, ওর ভেতরটা কী। কী দিয়ে তৈরী ময়না বউর প্রাণ। যা দিয়েই তৈরী হোক, তা বড়ো কঠিন, বড়ো শক্ত।

এই বারো বছরে তার শরীর আরো কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে।

দেড় কুড়ির কিছু কম বয়েস হবে ময়না বউর। কিন্তু মুখটা এখনো ঢল ঢলে। তেল-চক্ চক্ মুখের ওপর চোখ দুটো যেন ভাসছে। চোখ নয়তো, যেন সমুদ্দুরের জল-ভরা দুটি ঝিনুক।

ময়না বউ কোমরে কাপড় জড়িয়ে নেয়।

মংলা তার দিকে চেয়ে থাকে। এত সুন্দর সে ময়না বউকে কোনদিন দেখেনি। আজ মংলার যে কি হয়েছে, সে নিজেই বুঝতে পারছে না।

ঃ অমন করে চেয়ে আছিস ক্যানে? এ্যাঁ?

ঃ একটা কথা রাখবি, বউ?

ঃ কি?

শরীরের সবখানে ঠিক মতো কাপড় আছে কিনা ময়না বউ একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়।

ঃ আমাকে আজ একটু 'হাঁড়িয়া' দিবি?

ঃ হাঁড়িয়া? এই অবেলায়?

ঃ হ্যাঁ, একটু দে আমাকে। আজ তুই বড়ো লিশা ধরিয়ে দিয়েচিস্—

চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে ময়না বউর।

ঃ লিশা? আমি ধরিয়ে দিয়েচি?

খিল খিল করে হাসতে থাকে ময়না বউ।

ঃ আমি কি হাঁড়িয়ার কলসী? এ্যাঁ?—

লাগর, যোবতী ধরম
নাহি জান—
যোবতীর অঙ্গে কতো লিশা
কিছু নাহি জান—

সুর করে গেয়ে ময়না বউ আবার হেসে মংলার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে।

মংলার সঙ্গে ময়না বউর এই রসিকতা আজ নতুন নয়। কিন্তু মংলার কাছে আজ সবই নতুন লাগছে।

এক বাটি হাঁড়িয়া এনে ময়না বউ কয়েক চুমুক্ খেল।

তারপর মংলার দিকে বাকিটুকু এগিয়ে দিয়ে বলেঃ ধর্ ধর্ লাগর। দেরি করিস নি। সাঁঝ হ'য়ে আসচে। রাতে ভাত না হলে সব রস শুকিয়ে যাবে।

বাটিতে চুমুক দিয়ে মংলা ময়না বউর মুখের দিকে তাকায়। ঢলঢলে মুখখানা তার আরো ঢলঢলে লাগছে।

মংলার হাত থেকে বাটিটা নিয়ে মাটিতে রাখতে রাখতে সে বলেঃ ওঠ্। দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে? ঢেঁকিতে পাড় দে—

মংলা ঢেঁকিতে পাড় দিতে থাকে। ময়না বউ ধানগুলো ঢেঁকির মুখে ঠিক মতো এগিয়ে দেয়।

খানিক পরে সে মংলার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায়ঃ কিরে, লিশা ধরলো নি কি? পাড়ে জোর নাই দেখতিচি—

মংলা হেসে বলেঃ দু'য়ে না হৈলে ধান ভান্‌বো কেমন করি?

বলেই সে লজ্জা পেয়ে যায়। আজ তার কি হয়েছে? সে তো কোনদিন এ রকম ছিল না। সত্যি, তার আজ লিশা ধরেছে। কেমন একটা অদ্ভুত নেশা তার রক্তে ঘন ঘন পাক খাচ্ছে যেন। গরম হয়ে উঠেছে তার সমস্ত শরীর।

ময়না বউ মংলার দিকে তাকায়। চোখ দুটো তার আরো কালো, আরো ভাসা-ভাসা লাগছে।

ঃ অ, এত শিগ্‌গির তুই তৈরী হয়ে গেছিস্? জানতাম, কিচ্ছু জানিস না। বড়ো ভালো। অ মা, তুই যে এক্কেরে পাকা আঁটি—

দুম্ দুম্ করে মাটিতে পা ফেলে ময়না বউ মংলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঃ এবার তো দুই হয়েচে—

দুজনে ঢেঁকিতে পাড় দেয়। ঢেঁকির মুখে সশব্দে ধান গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তুষের ভেতর থেকে চাল বেরিয়ে আসছে। অন্য প্রান্তে দুটি শরীর তালে তালে নাচছে।

দুটি শরীর দুলছে আর ঢেউ ভাঙছে।

ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে ময়না বউর কোমরে জড়ানো কাপড়টা একটু উঠে গিয়েছিল। মাঝখানে কোমরের খানিকটা নরম অংশও বেরিয়ে পড়েছিল। মংলা তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ওর ওপর রাখে। সঙ্গে সঙ্গে ময়না বউ ওর হাতটা সরিয়ে দেয়।

ঢেঁকির পাড়-পড়ার ছন্দ কেটে যায়।

ঃ হাত দিস না বাপু। আমার কেমন সুড় সুড় করে। হাসি পায়। হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে যাবো তা'লে এখুনি—

মংলা একটু দুঃখ পেল। বোধ হয় একটু লজ্জাও। হাতটা সে সরিয়ে নেয়।

আবার ঢেঁকিতে পাড় পড়তে থাকে। ঢেঁকিতে কেবল পাড়-পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

ময়না বউ বলে ঃ ওখানটা তোর জন্যে লয়—

ঃ ?

ঃ বুলানের জন্যে, বুঝলি ?

মংলা চেয়ে দেখলো, উঠোনে অন্ধকার জমছে। এইবার ঘরের চাল থেকে বুঝি রাত্রি গড়িয়ে পড়বে।

ময়না বউ ঢেঁকি থেকে নেমে এসে একপাশে বসলো। কুলো দিয়ে চাল পাছ্‌ড়াতে লাগলো একমনে। হঠাৎ চাল পাছ্‌ড়ানো বন্ধ

করে ঘাড় বেঁকিয়ে মংলাকে সে জিজ্ঞেস করে : হ্যাঁ রে, সমুদ্দুরে গেলে তোদের আর ঘরের কথা মনে থাকে না, না রে ?

: থাকবে নি ক্যানে ? খুব থাকে—

ময়না বউ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

: একজন গেছে। ওর আর ঘরের কথা মনেই পড়ে না।

ময়না বউ চাল পাছড়াতে থাকে।

কিন্তু কেন এই প্রতীক্ষা ? কেন এই শবরীর প্রতীক্ষা ? দীর্ঘ বারো বছরেও এই প্রতীক্ষার অবসান হলো না ?

রাতে নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ময়না বউ ভাবে। ঘুম আসে না তার চোখে। রাতে ভালো ঘুম হয় না কোনদিন।

বিছানায় গড়াতে গড়াতে ঘুম-ছুট্ দু চোখে সে শুধু সীমাহীন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিজের মনে ভাবে।

তিন মাস কতটুকু সময় ?

একটা ঢেউ আসতে আর ফিরে যেতে কি তার চেয়ে বেশি সময় লাগে ? ঢেউটা ফিরে গেল। কিন্তু চরের ওপরে কোন চিহ্নই রেখে গেল না। বিরাট সমুদ্রের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে গেল।

আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কখনো সে ফিরে আসবে না। তবে পদ্মবুড়ি যে বলে : যে ঢেউ যায়, সেই ঢেউই ফিরে আসে।

সব তাহলে মিথ্যে। মিথ্যে কথা বলে পদ্মবুড়ি তার মন ভুলিয়ে তার কাছ থেকে চাল আদায় করে নিয়ে যায়।

কিছুই ফেরে না।

যে যায়, সে তাহলে আর আসে না।

আর রাঘব যে তাকে বলে : সে ফিরে আসবে। তাও কি মিথ্যে ?

মিথ্যে, মিথ্যে ; সব মিথ্যে।

মিথ্যে কথা বলে তার মনটাকে শান্ত করে তাকে প্রতীক্ষা করতেই সবাই বলছে।

প্রতীক্ষা? কার জন্যে প্রতীক্ষা? নাকি বারো বছরের নিয়মের জন্যে প্রতীক্ষা? বারো বছর ধরে সে তো প্রতীক্ষা করলো।

এবার তাহলে বুলান ফিরে আসবে তো?

যদি সে ফিরে আসে?

ময়না বউর বুকটা ঢিপ ঢিপ করে ওঠে।

যদি সে ফিরে আসে? সে তাহলে কি করবে? কি বলবে তাকে? তখন সে বুকে কান্না চেপে শান্ত হয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারবে তো? না কি, বুক ফেটে মরে যাবে? মরে মরুক। তবু সে বলে যাবে: ওরে, তোর জন্যে বারো বছর আমি পথ চেয়ে রয়েছি। তোর জন্যে এই শরীরটাকে এখনো নষ্ট হতে দিই নি। এ শরীরটা যে তোর। এর কাছে কাউকে আসতে দিই নি আমি। আমার কথা আমি রেখেছি। এবার আমায় মরতে দে।

কিংবা সে বলবে: আর তোকে ছাড়বো না। আর তোকে সমুদ্দুরে পাঠাবো না। এবার তুই আমার কাছে বসে থেকে চাল ভাজা খাবি। এক-পা কোথাও যেতে পারবি না।

তোর বাপ যদি রাগ করে, করুক।

বিড় বিড় করে এ সব কী প্রলাপ বকছে ময়না বউ? তার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? সারা গা-টা তার কাঁপছে কেন? শরীরের রক্ত তার সমুদ্দুরের ঢেউ এর মতো এমন উথাল পাথাল করছে কেন?

তবে কি সে ফিরে আসবে?

ময়না বউ বুলানের মুখটা একবার মনে করবার চেষ্টা করে।

বারো বছর আগে দেখা সেই মুখ। কেবল তিনমাসের জন্যে দেখা। তারপর আর সে দেখতে পায় নি।

অনেক চেষ্টা করে সে। বুলানের মুখটাকে মনে মনে আঁকবার অনেক চেষ্টা করে সে। কিন্তু পারে না। মনে পড়ে না।

যেন সমুদ্দুরের চরের বালিতে আঁকা একটা অস্পষ্ট ছবি। কে যেন দুষ্টুমি করে মুছে দিয়েছে।

না, আর কেউ নয়। সমুদ্রই মুছে দিয়েছে চিরকালের মতো।

তারপর অনেক চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু কিছুতেই আঁকতে পারে নি। বারে বারে অন্য রকম হয়ে যায়।

অনেকটা মংলার মুখের মতো। হ্যাঁ, বারে বারে মংলার মুখই এঁকে ফেলে সে। অবশ্য বুলানের মুখের সঙ্গে মংলার মুখের অনেকটা মিল আছে। তা থাকুক।

তবু সে বুলানের মুখটা আঁকতে পারে না কেন? সে কি শুধুই জলের লেখা?

হ্যাঁ, জলের লেখাই। জলের লেখা জলেই মুছে গেছে। আর সেখানে ভেসে উঠছে মংলার মুখ।

বোধ হয় এর সঙ্গে আজ ঘনাই মণ্ডলের আসা আর বুলানের বাপের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগ আছে।

তা নইলে বুড়োর সঙ্গে মোড়লের কথা কাটাকাটিই বা হবে কেন? তাকে নিয়েই যে কথা কাটাকাটি হয়েছে, সে কথা বুঝতে তার এতটুকু কষ্ট হয় নি।

সমুদ্দুরের শব্দে সব কথা দূর থেকে শোনা যায় নি বটে, কিন্তু সে মনে মনে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে যেটুকু শুনেছে, তাতেই সে বুঝতে পেরেছে তাদের দুজনের কথা কাটাকাটির বিষয় সে ছাড়া অন্য কেউ নয়।

বারো বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র তিন মাস বাকি।

তারপর মংলার সঙ্গে তার আবার বিয়ে হবে। আবার নতুন শাড়ি পরবে সে, নতুন শাঁখা, নতুন সিঁদুর।

এতদিন বুলানের বউ ছিল সে, এবার থেকে সে হবে মংলার বউ। বিছানার এই খালি জায়গাটায় মংলা শুয়ে থাকবে তাকে জড়িয়ে।

ভাবতেই ময়না বউর সারা শরীরটা শিরশির করে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

কিন্তু তাতে সে আপত্তিই বা করতে যাবে কেন? তার মারই তো এই ভাবে বিয়ে হয়েছিল। সাপে কামড়েছিল তার বাপকে। ছোট ভাই মগ্‌রা হয়েছিল তখন। মা তার কাকাকেই বিয়ে করলো। মগ্‌রা কাকাকে কিছুতেই বাপ বলে ডাকবে না।

তাই নিয়ে সে কী কাণ্ড!

তারই বা এ বিয়েতে আপত্তি থাকবে কেন?

কিন্তু মংলার সঙ্গে বিয়ের পর যদি বুলান ফিরে আসে?

দাওয়ায় বুধিয়া ঘুমের ঘোরে কি যেন বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

ঘুমের ঘোরে কথা বলা বুধিয়ার স্বভাব। ছোটবেলায় সে য.. ময়না বউর কাছে শুতো, তখন সে এক একদিন ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে উঠতো। ময়না বউ ধমক দিলে তবে চুপ করতো।

আজ তার চিৎকারে মুরগীগুলো পর্যন্ত ঘুম থেকে জেগে উঠে কক্ কক্ করে উঠলো।

রাঘব ডাকে : বুধিয়া, অ বুধিয়া, ঠিক হয়ে শো—

মংলা জেগেই ছিল। তারও চোখে ঘুম নেই। তেষ্টা পেয়েছে তার। কিন্তু কি করে সে জলের জন্যে ময়না বউকে ডাকবে? রাঘব জেগে আছে। কি ভাববে তাকে?

যাই ভাবুক, তেষ্টা পেয়েছে তার। বুক জুড়ে অসহ্য তেষ্টা।

মংলা বিছানা থেকে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রাঘব জিজ্ঞেস করে : কে রে?

মংলা জবাব দেয় : আমি—

: অ। মংলা?

: হুঁ—

: ক্যানে?

: তেষ্টা পেয়েচে—

মনে মনে রাঘব মংলার ওপর ভীষণ চটে যায়।

গাঁয়ের লোকেরা যে সব কথা বলাবলি করে, তা তাহলে একেবারে মিথ্যে নয়। এই জন্যই তো ঘনাই আজ তাকে অপমান করে গেছে।

না, এই ঘটনাকে সে বেশি দূর এগোতে দেবে না। মংলা আর ময়না বউর এই ঢলাঢলি সে আর বেশিদিন সহ্য করবে না।

মংলা ভেতরে কারো সাড়া না পেয়ে আবার দরজায় ঠেলা দেয়। বাঁশের দরজা ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ শব্দে আর্তনাদ করে উঠে আবার থেমে যায়।

ঃ কে—?

ময়না বউর গলা শোনা যায়।

ঃ আমি—মংলা—তেষ্টা পেয়েচে—

ময়না বউ দরজা খুলে দেয়।

মংলা কিছু না বলে ভেতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ময়না বউ তার কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করে ঃ খুব তেষ্টা, লয় রে ?

মংলা নীরব।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে ময়না বউ জিজ্ঞেস করে ঃ ঘুমাস্‌ নি একদম ?

ঃ না।

ঃ আমারও ঘুম আসচে নি। কি যে হয়েচে—

অন্ধকারে কলসী থেকে ঘটিতে জল ঢালবার শব্দ শোনা গেল।

মংলার হাতে ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে ময়না বউ বলে ঃ লে, খা—

মংলা গলায় খানিকটা জল ঢেলে নিয়ে ঘটিটা ফিরিয়ে দেয়।

ময়না বউ কাছে মুখ এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ঃ আমারও খুব, তেষ্টা। এই ত্থাখ্‌—

ময়না বউ মংলার একটা হাত বুকের ওপর চেপে ধরতেই মংলা চমকে ওঠে ঃ এ কী ! তোর গা যে পুড়ে যাচ্চে ! জ্বর হয়েচে তোর ?

ময়না বউর সমস্ত দেহটা চাপা হাসির তোড়ে যেন দুলছে।

ঃ এ তোদের জ্বর নয় রে। এ ভালোবাসার জ্বর। বুঝলি ?

বলে ময়না বউ ঘটি থেকে ঢক্ ঢক্ করে জল খেল। তারপর মংলাকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজায় খিল তুলে দিল।

তখনও ভোর হতে অনেক বাকি।

বালিয়াড়ির ওপারে সমুদ্র চরের দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ গর্জন করে ওঠে। নারকেল গাছের পাতার ঝালরে নাড়া দিয়ে একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস এলোমেলোভাবে বয়ে যায়। ঠিক তখনই মংলাদের সাঁড়া মোরগটা রাতের আঁধারকে চিরে গলা ছেড়ে ডাক দিয়ে ওঠে।

সারা রাতের জাগরণের ক্লান্তি নিয়ে ময়না বউর চোখ দুটো ভোরের দিকে একটু বুজে এসেছিল। মোরগের ডাকে তার চোখের পাতা থেকে ঘুম ছুটে যায়।

আর ঘুম আসে না। চোখ বুজে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে সে।

কিন্তু পড়ে থাকার কি জো আছে ?

দাওয়ায় রাঘব গলা ফাটিয়ে হাই তোলে। ভয় পেয়ে কয়েকটা কাক ডাক হাঁক করে গাছ বদল করে নেয়। তারপর রাঘব কাঠকয়লা ধরিয়ে তামাক সাজে। তার তামাক টানার শব্দে রাত ভোরের দিকে গড়িয়ে চলে।

তারই মাঝে বুড়ো ডাক দিয়ে ওঠে ঃ মংলা, বুধিয়া, অ ময়না বউ—

গাঁয়ের দিক থেকেও মানুষের গলা শোনা যায়। কাক, কুকুর আর মোরগের ডাকে মাছমারি গাঁয়ের ভোর হয়।

মংলা, বুধিয়া আর ময়না বউ উঠে পড়ে। যে যার কাজে লেগে যায়। ময়না বউ জলের কলসী, ভাতের হাঁড়ি, তেঁতুলের গোলা আর কিছু কাঁচা লঙ্কা এগিয়ে দিয়ে যায়। জাল, বাঁশ, দড়ি-দড়া—সব ঠিক মতো গুছিয়ে বেঁধে নেয় মংলা। ঘুম চোখে বুধিয়া তাকে সাহায্য করে।

গাঁয়ের পথে লোক চলতে সুরু করে।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে জড়িয়ে মাছমারি গাঁয়ের জেলেরা জাল বাঁশ কাঁধে করে বালিয়াড়ি পেরিয়ে চরের-ওপর-পড়ে-থাকা ডিঙিগুলোর দিকে চলে যায়। তাদের কথাবার্তার টুকিটাকি বাতাসের মুখে উড়ে আসে।

মংলা রাঘবকে লক্ষ্য করে বলে ঃ ডিঙিটা এবার সারাতে হবে—

রাঘব তামাক টানতে টানতে সংক্ষেপে উত্তর দেয় ঃ হুঁ—

ঃ আর বেশিদিন ভাঙা ডিঙিতে চলবে নি।

ঃ তালে তো মহিষাজোড় গাঁয়ে একবার যেতে হয়।

মহিষাজোড়ে ডিঙির মালিক গোকুল গায়েনের বাড়ি।

মাছমারি গাঁয়ের সমস্ত ডিঙিই গোকুল গায়েনের। সে জেলেদের ডিঙি ভাড়া দেয়। পৌষ মাসে সারা বছরের ভাড়া বাবদ দু কুড়ি টাকা আদায় নেয়।

আগে ভাড়া ছিল দশ টাকা। এখন বড়ো 'মাগ্‌গীগোণ্ডার' দিন। মাছও আগেকার মতো জাল ভর্তি হয়ে ওঠে না। কিন্তু বছরের শেষে গোকুল গায়েনের ভাড়ার দু কুড়ি টাকা চাইই।

বাকি পড়লে ডিঙি ছেড়ে দাও—কড়া লুটিশ।

ভেঙে গেলে সারিয়ে দেবার জন্যে কতো উমেদারি করো। তবু সারিয়ে দেবার নামগন্ধ নেই। আর ডুবে গেলে পুরো দুশো টাকা।

সেবারে ডিঙিটা ডুবে গেলে গোকুল গায়েন দুশো টাকাই চেয়েছিল। কাটা পা নিয়ে রাঘব অনেক সাধাসাধি করায় পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গোকুল গায়েন তবে ছাড়ে।

সেই বছরই একটা নতুন ডিঙি রাঘবকে দেওয়া হয়েছিল।

এই বারো বছরে আর ওতে হাত দেওয়া হয় নি।

মংলা বলে ঃ মহিষাজোড়ে তুই যাস্ বাপ, আমি ওই চামচিকের কাছে যেতে পারবো নি।

রাঘব কিছু বলে না।

মংলা আর বুধিয়া জাল কাঁধে তুলে নেয়। ময়না বউ ভাতের হাঁড়ি আর জলের কলসী মাথায় নিয়ে চলতে থাকে ওদের পেছন পেছন।

পুব আকাশে তখন আলো ভাঙছে।

গাঙচিল বেলেহাঁসেরা মাঝ-সমুদ্রের দিকে দল বেঁধে উড়ে চলেছে।

ডিঙিতে জাল, ভাতের হাঁড়ি, জলের কলসী—সব গুছিয়ে রেখে দু ভাই বালির ওপর দিয়ে ডিঙিটাকে ঠেলে নিয়ে যায় জলের ধারে। সমুদ্র ঢেউএর জিভ বাড়িয়ে ডিঙির গা-টা চেটে দিয়ে ফিরে যায় একবার।

তারপর প্রতীক্ষা।

একসময় সেই প্রতীক্ষার ঢেউ আসে। জেলেরা বলে 'সাঁড়া' ঢেউ। ডিঙিটা গা ছেড়ে দিয়ে ভেসে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে দুভাই 'গঙ্গা মাই কী জয়' বলে সমুদ্রের দিকে চেয়ে নমস্কার করে ডিঙিটাকে প্রাণপণে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো।

বুধিয়া লগি মারছে, মংলা ধরেছে হাল।

ঢেউএর ওপর দিয়ে ডিঙিটা একটা মোষের মতো লাফাতে লাফাতে দক্ষিণ মুখে ছুটে চলে।

ছোট্ট কাপড়টাকে শক্ত করে পরেছে মংলা আর বুধিয়া। দূর থেকে মনে হয় নেংটির মতো। মাথায় শক্ত করে বাঁধা গামছা।

ডিঙিটা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ওদের নিয়ে চলেছে মাঝ-দরিয়ার দিকে।

মংলা ঢেউগুলো কাটিয়ে হালটাকে একহাতে ধরে পেছন ফিরে তাকায়। দূর থেকে ময়না বউর দিকে চেয়ে সে হাত তুলে ইশারা করে।

চলি তাহলে।

ময়না বউ হাত নাড়ে। মুখে তার বালির ওপর সূর্যের প্রথম আলোর মতো একটুকরো হাসি।

এসো। শুভ হোক তোমাদের আজকের সমুদ্র-যাত্রা।

তারপর সে একটা ভয় দুরু দুরু নিশ্বাস বুকে চাপতে গিয়ে মনের অজ্ঞাতে চরের ওপর ফেলে রেখে ঘরে ফিরে আসে।

ফেরার সময় দেখে, মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে বেলে-হাঁস সমুদ্দুরের দিকে ভেসে চলেছে। ওদের ডানায় ভোরের সোনালি রোদ্দুর ঝিক্‌মিক্ করছে। গলায় ওদের রৌদ্র-স্নানের আনন্দ কাকলি।

ময়না বউ ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকায়। ছেঁড়া মালার সারি ভেসে চলেছে রৌদ্র-সিক্ত আকাশের বুকে।

ওরাও তাহলে চলেছে।

দিবসের প্রথম অভিযান।

ময়না বউ ঘরে ফিরে এসে মুরগীর ঘরের আগল খুলে দেয়। ওরাও বেরিয়ে পড়ে আলোর জগতে। বাঁচার আগ্রহে তাড়াহুড়ো পড়ে যায় ওদের মধ্যে। কে আগে যাবে ?

রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাকেও যেতে হবে। সমুদ্রের চরে চরে তাকে ঘুরতে হবে, খুঁজতে হবে। তার যে কতো কাজ।

তার কি বসে থাকলে চলে ?

: জেলের ঘরে জন্মেছিস, তোর কি বসে থাকলে চলবে ? এ্যাঁ ? রাঘব বুধিয়াকে বলে।

বুধিয়া সমুদ্রে যাবে না।

তার সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করে না। সমুদ্রকে সে ভয় পায়। সমুদ্রের ভয়ঙ্কর উদ্দামতায় সে কোন উৎসাহ খুঁজে পায় না। তার ভীরু রক্তে সমুদ্র কোন সাড়াই জাগাতে পারে না।

না, সমুদ্র তাকে ডাকে না। সমুদ্রে সে যাবে না।

রাঘব বলে : জেলের পো তুই। জলেই তোদের ঘর। সমুদ্দুরকে

ডর পেলে কি চলে? ঢেউএর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে কাবু করতে হবে। সমুদ্দুর ছেঁচে মাছ আনতে হবে ধরে। তবেই তো তুই জেলে। তবেই তো তুই মরোদ—

গজ গজ করতে করতে রাঘব দাওয়ায় উঠে এসে বসে। লাঠিটাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখে।

খুব রোদ্দুর উঠেছে। বোশেখের রোদ্দুরে বড়ো ঝাঁঝ। নোনা জলে, নোনা মাটিতে ঝাঁঝটা যেন আরো বেশি।

নারকেল গাছের পাতাগুলো অঙ্গ দোলায়, ছায়াগুলো সমুদ্রের ঢেউএর ছন্দে যেন নাচতে থাকে।

ঃ বসে খেলে সমুদ্দুরের বালিও একদিন ফুরিয়ে যাবে। খাটতে হবে। বুঝলি? জেলের পো তুই। সমুদ্রের সঙ্গে লড়তে হবে। জাল বোন্, মাছ ধরে আন্। তবেই সুখে থাকতে পারবি। তা লয়, দিন রাত্তির খালি বাঁশি আর বাঁশি। ওরে হারামজাদা, বাঁশি কি তোকে বসিয়ে খাওয়াবে, না পরাবে?

বুধিয়া এসব কথা রাঘবের মুখ থেকে বহুবার শুনেছে। কিন্তু কথাগুলো তার মনে গাঁথে নি। এসব কথা শুনে তার ভয় হয়। সারা জীবন শুধু সমুদ্রের বুকের ওপর কাটিয়ে দিতে হবে?

না, সে তা পারবে না।

ঃ তা'লে কি করবি তুই? এ্যাঁ?

মুখ ফুটে একদিন সে বলেও ফেলেছিল ঃ আমি যাত্রার দলে চাকরি করবো। বাঁশি বাজাবো। আমার কথা ভাবতে হবে নি কাউকে?

ঃ চাকরি করবি? তুই?

বুধিয়া চাকরি করবে? যাত্রার দলে? ভদ্দর লোকদের সঙ্গে একসাথে বসে বাঁশি বাজাবে?

রাঘব ভাবে।

কিন্তু সে তো গুলামি। হাজার হাজার পুরুষ ধরে তারা যে মাছ ধরার ব্যবসা করে আসছে, তা ছেড়ে বুধিয়া যাত্রার দলে গুলামি করবে?

না, সে তা হতে দেবে না। বুধিয়াকে বাঁশি বাজাতে সে দেবে না।

ঃ জাত ব্যবসা ছেড়ে গুলামি করবি তুই ? ও সোব হবে নি বাপু। বলে রাখচি। হ্যাঁ—

বুধিয়া মুখ শুকিয়ে আড়ালে সরে যায়।

বুধিয়া চেহারায় যে খুব লম্বা, তা নয়। বরং সে সকলের চেয়ে একটু বেঁটে। কিন্তু রোগা গড়নের জন্যে তাকে একটু লম্বা মনে হয়। মাথায় লম্বা চুল। গলায় মাদুলি। চোখ দুটি ডাগর ডাগর, কিন্তু বড়ো করুণ। রোগা চেহারার জন্যে চোখের পাতার চুলগুলি বেশ বড়ো বড়ো। সব মিলিয়ে একটা বিষণ্ণতার ছাপ।

একটা মূর্তিমান বিষাদ যেন সে।

পদ্মবুড়ি বলে ঃ ওটা গতজম্মে একটা পাখি ছিল, জানিস্ ময়না বউ। ত্যাখ্ না ওর শরীলটা কেমন পাখির মতোন হালকা আর লরম। পাখির মতোন ও গান শুনতে ভালোবাসে—

ময়না বউ হেসে ওঠে ঃ ওর তাহলে এখনো দুটো ডানা গজাতে বাকি রয়েচে, না পদ্মবুড়ি ?

বুধিয়া লজ্জা পায়।

কিন্তু পদ্মবুড়িকে তার বড়ো ভালো লাগে। পদ্মবুড়ির মতো গল্প বলতে আর ছড়া কাটতে মাছমারি গাঁয়ের কেউ পারে না। কতো রকমের গল্প জানে বুড়ি আর কতো ধরনের ছড়া।

পদ্মবুড়ি বলে ঃ এই যে পলাশ বন দেখচিস, ওখানে আছে এক গন্ধব্বো আর এক গন্ধব্বুনি। জেলে মরোদ আর যোবতীর বেশে ওরা ঘুরে বেড়ায়। যেমন দেখতে মরোদটাকে, তেমনি যোবতীটাও দেখতে—ভারি সোন্দর। পাশ দিয়ে চলে যা। ফুলের গন্দো। কি ফুলের গন্দো বলতে পারবি নি তুই। না, অনিষ্ট ওরা কারো করেননা। নিজের মনে থাকেন আর ঘুরেন। কিন্তুক—

পদ্মবুড়ি একটু দম নেয়।

ময়না বউ বলে ঃ কিন্তুক—

পদ্মবুড়ি গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করে: কি বলতিচিল্লাম?

ময়না বউ বলে দেয়: সেই গন্ধব্বো আর গন্ধোব্বুনি—

পদ্মবুড়ি বলে চলে: অ—হ্যাঁ। মনে পড়েচে। কিন্তুক ওদের হাওয়া যদি কারো গায় নেগেচে, তা'লেই সব্বোলাশ।

: ক্যানে?

: আবার ক্যানে? মরোদ বাউরি হয়ে যায়, যোবতী বাউরি হয়ে যায়। কুথায় বা ঘর, কুথায় বা চর; কুথায় মাছ, কুথায় ডিঙি। পেটে খিদা থাকে না, মুখে রুচি থাকে না, চক্ষে ঘুম থাকে না। সোব সময় মনটা উড়ু উড়ু। ঘরের রান্না পুড়ে যায়, জালের মাছ যায় পালিয়ে।

ময়না বউ বলে: আমারও যে রাত্তিরে ঘুম আসে না, পদ্মবুড়ি—

পদ্মবুড়ি তার পিচুটি-ভরা চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বলে: খুব সাবধান। পলাশ বনের দিকে কুনোদিন যাস না তুই, বউ। ওদের হাওয়া গায় লাগলে আর রক্ষে নাই। শরীল শুকিয়ে যাবে। বুকটা আন্‌চান্ করবে—

কুথায় গেলে বলে দে না
লাগর, তোকে পাই
পরাণ পোড়েন অঙ্গ পোড়েন
চক্ষে নিদ্রা নাই—

সুর করে গাইতে থাকে পদ্মবুড়ি।

ময়না বউর বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে।

বুধিয়া বলে: তারপর?

পদ্মবুড়ির একটিও দাঁত নেই। হাসতে গেলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। মাড়ি বের করে হাসতে হাসতে সে বলে: তারপর? তারপর আর মনে নাই—

আর একদিন পদ্মবুড়ি বলেছিল এক জেলের মেয়ের রাণী হওয়ার গল্প। হ্যাঁ, সেই জেলের মেয়ে রাণী হয়েছিল।

সে ঢের ঢের বছর আগের কথা। এক জেলের এক যোবতী মেয়ে নদীতে মাছ ধরছিল। জেলের মেয়ে বটে, কিন্তু তার রূপের জুড়ি ছিল না।

পদ্মবুড়ি বলেছিল ঃ ঢল ঢল শরীল যেন ভেঙে ভেঙে পড়তিচে। চক্ষে আগুন, শরীলে লিশা। নদীতে মাছ ধরচিল আর মনের আনন্দে জলের ওপর নিজের মুখ দেখচিল। তারপর আইলেন রাজা মিরগয়া করতে। রাজা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখলো কন্যার রূপ। রূপ দেখে তো রাজার মাথা ঘুরে গেল। বাউরা হয়ে গেল রাজা। বললো ঃ আমি এই কন্যাকে বে করবো। কিন্তুক—

পদ্মবুড়ি ঢোক গিললো।

তারপর বলে ঃ কিন্তুক রাজার বাড়িতে রয়েচে এক রাণী, এক ছেলেও রয়েচে। বে কেমন করে হবে? এদিকে রাজা তো বাউরা। যোবতী কন্যার রূপ রাজার শরীলে লিশা ধরিয়ে দিয়েচে। রাজা মাথা ঘুরে নদীর চরে পড়ে রইলো। বললো ঃ বে না করে ও রাজ্যে ফিরবে নি।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপরের কথা আর একদিন শুনিস। আজ চাল দিয়ে দে। আরো দু ঘর যাবো। সাঁঝ হয়ে গেলে দেখতে পাবো নি কিছু।

বাকিটুকু পদ্মবুড়ির কাছে বুধিয়ার আর শোনা হয় নি।

কিন্তু যাত্রায় সে দেখেছে। মহিষাজোড় গাঁয়ে বাবুরা যাত্রাদল ভাড়া করে এনেছিল।

পালার নামটা বুধিয়ার মনে নেই। কিন্তু তাতে সেই রাজার কথা, সেই জেলের মেয়ের কথা আছে। রাজার ছেলেটা এসে মেয়ের বাপের কাছে শপথ করলো, সে জীবনে রাজা হবে না, বিয়ে করবে না। তখন রাজার সঙ্গে জেলের মেয়ের বিয়ে হলো। জেলের মেয়ে হলো রাজরাণী।

ছোটবেলা থেকেই বুধিয়ার যাত্রার নেশা।

পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে যেখানেই যাত্রা গান হোক, বুধিয়ার যাওয়া চাই। লোকের মুখে কিংবা মাছের বেপারিদের কাছে সে জানতে পারে, কোথায় যাত্রা হচ্ছে। অমনি সন্ধে না হতেই সে ময়না বউকে বলে দুটো পান্তাভাত খেয়ে আর দু এক আনা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

যাত্রার গল্প আর গান মুখস্ত করে ভোর রাতের হাওয়া ঠেলে সে ঘরে ফিরে আসে।

ততক্ষণে হয়তো মংলা ডিঙিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাপের ভয়ে সেও জালের বাঁশ কাঁধে তুলে নেয়।

ডিঙিতে বসে সে যাত্রার গল্প আর গান···

ওগুলো কতো সত্যি, কতো বাস্তব।

পলাশ বনের মাথায় সূর্য হেলে পড়ে।

রোদের গায়ে একটি মিষ্টি আমেজ লাগে। নারকেল গাছের ছায়াগুলো গম্ভীর হয়ে চেয়ে থাকে। পলাশ বনের বুকের ভেতর একটা অজানা রহস্য থম থম করে কাঁপতে থাকে।

বুধিয়ার চোখ দুটিও ঘন হয়ে ভারি হয়ে ওঠে।

রক্তিম নেশায় ভরা পলাশ বনের ঘনায়মান অন্ধকার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে আর ঘরে থাকতে পারে না। গোপন জায়গা থেকে বাঁশিটা বের করে এনে সে বেরিয়ে পড়ে।

বিকেলের আলোছায়ার নক্সা-কাটা মাছমারি গাঁয়ের পথ পেরিয়ে, পলাশ বনের ঝরে-পড়া শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে সে চলে যায়।

তখন সত্যি সত্যি একটা মিহি বাতাস তার গায়ে এসে লাগে। কয়েকটা শুক্‌নো পাতা আচম্‌কা একটা ঘূর্ণির বেগে উড়ে উঠে দুএকবার ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

পলাশ বনের দক্ষিণ-বরাবর উঁচু বালিয়াড়ি। স্থলকলমীর লতা-পাতাগুলো নিবিড় স্নেহে তাকে জড়িয়ে রয়েছে। বালিয়াড়িটার নিচে দাঁড়ালে পশ্চিম দিকের সমুদ্র বাধাহীনভাবে চোখে পড়ে।

তখন বুধিয়ার মনের ভেতরটাও কেমন যেন হয়ে যায়।

সামনে আকাশ ও সমুদ্রের আবীর-মেশানো নীলের অবাধ বিস্তার।
পায়ের কাছে প্রশস্ত বালির চর। যেন প্রকাণ্ড একখানি বালুচর শাড়ি।

পেছনে পলাশ বনের রক্তিম চিৎকার।

বুধিয়া বালিয়াড়ির গায়ে হেলান দিয়ে পশ্চিম আকাশের দিবে চেয়ে বালির ওপর বসে পড়ে। পা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দূর দিগন্তে রঙের উৎসবের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

সেই রঙের সমুদ্রে সাঁতার কেটে এক টুক্‌রো ঘরছাড়া মেঘ ভেসে যায়, ছেঁড়া ছেঁড়া মালার মতো সমুদ্রপাখির সারি ডাঙায় ফিরে আসে বালির চরের ওপর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে।

বুধিয়া বাঁশি বাজায়।

পদ্মবুড়ির কাছে কিংবা যাত্রার দলে সে যতো গান শুনেছে, সবই এখন তার বুকের মধ্যে বেজে বেজে উঠতে থাকে। তার সুরগুলিবে সে নিজের মনে তার বাঁশিতে বাজিয়ে চলে।

সামান্য অপরাধে রাজা রাজপুত্রকে নির্বাসনে পাঠালেন।

বন, বনের পর সমুদ্র।

কাঠের ভেলায় করে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে সে এ নতুন দেশে গিয়ে পৌঁছুলো। সমুদ্রের কূলেই একটা বাগান। বাগানে পাশে ভিড়লো তার ভেলা।

বাগানটা ছিল এক মালিনীর। ফুল ফোটে না বলে মালিনীর ছি বড়ো দুঃখ। কিন্তু সেদিন নানা রকমের ফুলে ভরে গেছে তার বাগান

মালিনীর মনে আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু কি করে এতো ফুল ফুটলো?

মালিনী ঘুরে ঘুরে দেখছে। এমন সময় চোখে পড়লো, ভেল করে এক রাজপুত্র ভাসছে সমুদ্রের জলে। মালিনী রাজপুত্রকে ঘা নিয়ে এলো।

রাজপুত্র মালিনীর ঘরে থাকে।

মালিনী ফুল আর ফুলের মালা নিয়ে ওই দেশের রাজার বাড়িতে যায় আর রাজপুত্র তার ঘর সামলায়।

একদিন রাজপুত্র একখানা মালা তৈরী করে দিল।

রাজকন্যা সেই মালা দেখে তো অবাক।

এমন মালা তো ও দেশের কেউ কখনো দেখে নি। কেউ জানে না এমন মালা তৈরী করার কৌশল। মালিনীকে জিজ্ঞেস করে রাজকন্যা জানতে পারলো রাজপুত্রের পরিচয়। রাজপুত্রকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো রাজকন্যা।

মালিনীকে ধরে পড়লো সে—যেমন করে হোক আমার সঙ্গে ওর একবার দেখা করিয়ে দাও।

রাজপুরীর বাইরে বকুলতলা। র ঝাঁকাটা

গভীর রাত্রিতে সেখানে হলো রাজপুত্রের সঙ্গে রাজক

রাজপুত্রকে দেখে রাজকন্যা ভালোবেসে ফেললো। কোনদিন

দিনের পর দিন যায়।

রাজকন্যা রাজপুত্রকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু রাজা বপদ না অমন বিয়ে। শেষে রাজকন্যার জিদই বজায় রইলো। রাজকন্যাত বিয়ে করে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলো।

সমুদ্রের জলে রঙের খেলা সেরে সূর্য অস্ত যায়।

সমুদ্রের অন্তহীন দীর্ঘশ্বাসে আকাশের বুক ছলছলিয়ে ওঠে। পশ্চিম আকাশের রঙের সমারোহ ধীরে ধীরে মুছে যায়। সেখানে গা ঢেলে দিয়ে পড়ে থাকে এক অনন্ত সুনীল অবকাশ।

তারপর অন্ধকার শুরু হতে থাকে।

সমুদ্র ও আকাশ এক বিশাল অন্ধকারের সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস চরের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বুধিয়া উঠে দাঁড়ায়।

একটা গাঢ় বিষণ্নতা আব্ছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বালিয়াড়ি আর পলাশ বনের পথ পেরিয়ে মাছমারি গাঁয়ের দিকে নিঃশব্দে ফিরে আসে।

কোন্ ভোরে মংলা আর বুধিয়া ডিঙি নিয়ে চলে গেছে।

এবার ফেরার সময় হলো।

মাছমারি গাঁয়ের ডিঙিগুলো একে একে ক্লান্ত পাখির মতো ঢেউ কাটিয়ে এইবার চরে ফিরে আসবে।

চরে তাই এখন ভিড় জমতে সুরু করেছে।

মাছমারি গাঁয়ের যারা ডাঙাকেই এখন বেশি করে চেনে, তারা পদ্ম আর এসেছে বেপারিরা।

এখন তারা আসছে।

সে নিজেও জোয়ার আসছে মাছমারির চরের ওপর।

..রদের মধ্যে মৈনিমাসিও এসেছে। কদিন পরে মৈনিমাসিকে ..রির চরে দেখা গেল। কদিন মৈনিমাসি মাছ নিতে আসে নি। ..য়েছিল, কে জানে?

আজ আবার সে এসেছে। সঙ্গে তার নতুন একজন।

ঘনাই মণ্ডল জিজ্ঞেস করেঃ অ মৈনি, ওটা কে?

মৈনিমাসি মুখ না ফিরিয়েই বলেঃ বুন্-ঝি। ক্যানে?

ঃ কুনোদিন দেখিনি তো। তাই শুধালাম।

ঃ অ—

মৈনিমাসি মেয়েটাকে আড়াল করে পেছন ফিরে বসে।

দুটো ছোকরা বেপারি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই মৈনিমাসি খ্যাঁক্ করে ওঠেঃ কি দেখছিস্ রে হাঁ করে চেয়ে? এ্যাঁ?

ছোকরা বেপারি দুটো ফিক করে হেসে একদিকে সরে যায়।

মৈনিমাসি গলা নামিয়ে বিশ্বস্ত স্বরে বলে ঃ সুহাগী, ঠিক হয়ে ব'স্‌।

ওদিকে একটু দূরে জলের ঘটি হাতে ময়না বউ যেন সোহাগীর শরীরটাকে একদৃষ্টে জরীপ করছিল।

কতোই বা ওর বয়েস হবে ? এক কুড়িরও কম।

কিন্তু সোহাগীর চেহারার মধ্যে একটা আশ্চর্য ধার আছে। চঞ্চল দুটি চোখে যেন একটা শান-দেওয়া চঞ্চলতা।

মৈনিমাসির শরীরটা ভালো নেই। তাই মেজাজটা আরো রুক্ষ।

কদিন জ্বর হয়েছিল তার। তাই কদিন মাছমারির চরে আসতে পারে নি সে। এখন সেরে উঠেছে বটে, কিন্তু বড়ো দুর্বল। মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে অন্যান্য বেপারিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে ছুটতে পারবে না আজ।

তাই সঙ্গে করে সোহাগীকে নিয়ে এসেছে। সে মাছের ঝাঁকাটা আজ মাথায় করে নিয়ে যাবে।

এতদিন মৈনিমাসি মাছের ব্যবসা করছে। কিন্তু কোনদিন সোহাগীকে সঙ্গে আনে নি। আনবার প্রয়োজনও হয়নি।

সে জানে, ডাগর মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা করতে আসার বিপদ কতো। ও তাকাবে, সে চোখ মারবে, সে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসবে। যেন কতো আপনার লোক। কিন্তু কিছুই মৈনিমাসির চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। সে জানে, এ সব নিরর্থক অন্তরঙ্গতার অর্থ কি।

চরের মানুষগুলোর মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে যায়।

ডিঙি ফিরছে।

পর পর ফিরে আসছে মাছমারি গাঁয়ের ডিঙিগুলো। মৈনিমাসি সোহাগীকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সোহাগী এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুড়িটাকে কাঁকালের ওপর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দেহটা তার ঈষৎ হেলে পড়েছে।

চরে ডিঙি ভিড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে চরের মানুষগুলো ডিঙিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চেঁচামেচি চিৎকার সুরু হয়ে যায়।

পর পর ফিরে এলো ডিঙিগুলো। তারি মধ্যে এক সময় মংলা আর বুধিয়ার ডিঙিটাও এসে ভিড়লো।

মৈনিমাসি আগে সবগুলো ডিঙির মাছ দেখবে। তারপর ঠিক করবে, কার মাছ সে কিনবে।

এক ছোকরা জেলের ডিঙির মাছ দেখে মৈনিমাসি চলে যাচ্ছিল। পেছনে সোহাগী।

ছোকরাটা ডাক দেয়ঃ অ মাসি, চলে যাচ্চিস যে? আমার মাছটা লিয়ে যা—

ওর মাছ মৈনিমাসির পছন্দ হয় নি। তাছাড়া ছোকরাটার তাকানোর ভঙ্গিটা তার বড়ো খারাপ লেগেছে।

ওর কথায় যেন আগুনে জল পড়লো। মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে মৈনিমাসি বলেঃ ক্যানে? তোর মাছটা কি সোনা দিয়ে মুড়ানো?

ছোকরাটা হিহি করে হাসতে থাকে।

ঃ নিলাজ—বেহায়া—

মৈনিমাসি বক বক করতে করতে অন্য ডিঙির দিকে পা বাড়ায়।

ইতিমধ্যে সোহাগী একটু এগিয়ে এসেছিল। পায়ের তলায় জল মাড়িয়ে সে দু তিনটে ডিঙি পেরিয়ে চলে যায়। কোনটাতেই ভালো মাছ নেই।

জল-ছুঁই-ছুঁই চরের ওপর দিয়ে হাঁটতে তার বড়ো ভালো লাগে। শরীর দুলিয়ে, কাঁকাল বেঁকিয়ে, পায়ের তলার জল মাড়িয়ে সোহাগী একটা ডিঙির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ডাকেঃ অ মাসি, এইটাতে—এইটাতে ভালো মাছ। এদিকে চলে আয়।

মৈনিমাসি কয়েকটা ডিঙির পাশ কাটিয়ে চলে আসে।

পেছন থেকে আবার কে ডাক দিলঃ অ মাসি, আমাদের মাছটা লিয়ে যা।

মৈনিমাসিও জবাব দেয় ঃ আজ ক্যানে? কুনোদিন তো ডাকিস্ না। না ডাকিস্ নাই ডাকিস্। মৈনিমাসি মন্দ। তো, তাকে আজ অত করে ডাকা ক্যানে? তোদের সব আজ হয়েচেটা কি?

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মৈনিমাসি চলে আসে।

সোহাগী ডাক দেয় ঃ শিগ্‌গির মাসি। শিগ্‌গির এখানে আয়—

মৈনিমাসি মংলার ডিঙির পাশে এসে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বেপারিদের লক্ষ্য করে বলে ঃ এ ডিঙির পাশে কেউ আসবি নি। এ মাছ আমি লিব।

বেপারিরা সরে যায়।

ছোকরা জেলেরা ডাক দেয় ঃ অ মাসি, মাসি—

ঃ মুখে আগুন—

মংলার মুখটা শুকিয়ে যায়। তার এত কষ্টে ধরা মাছ মৈনিমাসি নামমাত্র দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে আজ। অন্য বেপারিকে বিক্রি করলে সে দুগুণ দাম পেত।

মংলার করুণ মুখটার দিকে তাকিয়ে সোহাগী ফিক্ করে হেসে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে মৈনিমাসি ধমক দিয়ে ওঠে ঃ হাসচিস্ ক্যানে লা? কি হয়েচে তোর?

সোহাগীর মুখটা শুকিয়ে যায়।

মংলা সোহাগীর মুখের দিকে তাকায়। দুজনের চোখাচোখি হয়ে যায়। তখন জোয়ারের বেলা। পেছনে একটা ঢেউ ভেঙে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

কিছুই মৈনিমাসির চোখ এড়ালো না। সে বলে ঃ কত নিবি বল্ না শিগ্‌গির। জোয়ার আস্‌তিচে—

মংলা কত দাম চাইবে?

সোহাগী তার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু বেশি দাম না চাইলে যে মৈনিমাসি অনেক কম দাম দেবে। অথচ বেশি দাম চাইতে গিয়ে

সোহাগীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। মংলা ভাবে, দশ টাকাই চাইবে সে।

কিন্তু সোহাগীর মুখের দিকে চেয়ে সে বলে ঃ পাঁচ টাকা।

মৈনিমাসির চোখ দুটো কপালে উঠে যায়।

ঃ পাঁ-চ-টা-কা! লে, তিনটাকা। তিনটাকাই দিতেছি।

এত পরিশ্রমের পর মাত্র তিন টাকা!

মুখ শুকিয়ে মংলা তাতেই রাজী হয়ে যায়। সোহাগীর ঝাঁকায় সে মাছগুলো তুলে দেয়।

সোহাগী হাসি মুখে বলে ঃ যা বল্। তোর মাছগুলো বেশ— মংলার মুখের দিকে সে তাকায়। তার শান-দেওয়া দু চোখের চাউনি যেন মংলার বুক কেটে বসতে থাকে।

মৈনিমাসি শাসিয়ে ওঠে ঃ তুই থাম ছুঁড়ি। মাছের কি বুঝিস্ না তুই?

সোহাগী যেন দপ্ করে নিভে যায়। করুণ মুখেও সোহাগীকে সুন্দর লাগে।

বুধিয়া এতক্ষণ কোন কথাই বলে নি।

সে সোহাগীকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বেপারিদের মেয়ের এত রূপও হয়? নাকি ও মানুষ নয়। নাকি ও পদ্মবুড়ির গল্পের সেই গন্ধব্ব্ নি।

বুধিয়া অবাক চোখে সোহাগীকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

মৈনিমাসি সোহাগীর মাথায় ঝাঁকাটা তুলে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ক'দিনের জ্বরে মৈনিমাসিকে বড়ো কাবু করে দিয়েছে। সে ঝাঁকাটাকে খানিকটা তুলে আর তুলতে পারে না।

তার অক্ষম অবস্থা দেখে সোহাগী খিল খিল করে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা হাত ফস্কে পড়ে যায়।

সোহাগী হাসতে হাসতে জলের ওপর বসে পড়ে।

ঃ মরণ আর কি! হেসে মরচিস্ ক্যানে?

ছোকরা জেলে আর বেপারিরা হেসে ওঠে ঃ অ মাসি, কি হলো ?

মংলা ডিঙি থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসে। ঝাঁকাটাকে সোহাগীর মাথায় তুলে দেয়।

সোহাগী হাসতে হাসতে মংলার দিকে তাকায়। তার শাণিত দু চোখের চাউনিতে মংলার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে।

সোহাগী গম্ভীর হবার চেষ্টা করে আবার ফিক করে হেসে ফেলে।

পেছন দিক একটা ঢেউ ছুটে এসে মংলাকে আচম্‌কা ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

বেপারিরা মাছ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সোহাগীও ঝাঁকা নিয়ে ভিজে কাপড়-জড়ানো কাঁকাল দুলিয়ে ফিরে চলেছে।

পেছনে মৈনিমাসি।

মংলা সেইদিকে চেয়ে থাকে।

বুধিয়া বলে ঃ ডিঙিটাকে ধর্। বেলা হয়েচে—

মংলা লজ্জা পেয়ে ডিঙিটায় হাত লাগায়।

ডিঙিটাকে তুলে দিয়ে ফিরতেই সে ময়না বউকে দেখতে পায়। হাতে তার জলের ঘটি।

তাড়াহুড়োতে মংলার আজ জল খাওয়ার কথা মনে নেই। জলের ঘটিতে চোখ পড়তেই তার তেষ্টাও যেন বেড়ে যায়। অমনি সে জলের ঘটির দিকে হাত বাড়ায়। ময়না বউর ভাবে-ভঙ্গিতে আর যাই প্রকাশ পাক্, জলের ঘটি এগিয়ে দেবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না।

ঃ জল দে—

মংলা বলে।

ঃ খিদা তেষ্টা তো তোর আজ সব মিটে গেচে—

ময়না বউর কথা শুনে মংলা হেসে ওঠে। জিজ্ঞেস করে ঃ তোর আজ কি হয়েচে রে ?

ঃ আমার লয়, তোর—

মংলা একেবারে চুপ্‌সে যায়।

ময়না বউ তাহলে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে। তাহলে মেয়েটার জলে বসে-পড়া, তার মাথায় ঝাঁকা তুলে-দেওয়া—সবই দেখেছে ময়না বউ।

সে যে মেয়েটার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল কতোক্ষণ, তাও বোধ হয় ময়না বউর চোখ এড়ায় নি। ময়না বউ হয়তো কিছু ভাবলো।

তা ভাবুক। ময়না বউ তো তার কথা ভাবে না।

তার জন্যে যে ময়না বউ নয়, সে কথা তো ময়না বউ তাকে কতো বার বলে দিয়েছে। ময়না বউকে সে কোনদিনই পাবে না। তবে ময়না বউ ও রকম ভাবে কেন?

: বড় তেষ্টা পেয়েচে, জলটা দে—

ময়না বউ জলের ঘটি মংলার হাতে দিয়ে বলে : কাল থেকে ওই ছুঁড়িটার থেকে জল লিয়ে খাস্‌। বুঝলি?

মংলার জল খাওয়া হয়ে গেলে ঘটিটা তার হাত থেকে যেন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে ময়না বউ দ্রুতপায়ে বালিয়াড়ির ওপারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বুধিয়া সমুদ্রের ঢেউতে দুটো ডুব দিয়ে ফিরে আসে।

দুভাইতে জাল-বাঁশ কাঁধে তুলে নেয়। একজন হাতে নেয় হাঁড়ি, একজন নেয় কলসী।

বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে তারাও ফিরে চলে ঘরের দিকে।

বিকেলের রোদ্দুরে মংলাদের জালটা শুকোচ্ছে।

বাইরের উঠোনে যেন একটা কালো রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে।

রাঘব বেরিয়ে গেছে।

বুধিয়াও বেরিয়ে গেছে।

মংলা চোখ বুজে মাদুরের ওপর পড়ে রয়েছিল।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল, সেই কালো দুটো চোখের কথা। সেই দুটো চোখের তারার শাণিত চঞ্চলতার কথা। শান-দেওয়া ছুরির মতো কালো দুটি চোখের চাউনি তার বুকের পাঁজরার নিচে গভীর ভাবে কেটে বসেছে।

তার ঢেউ-তোলা হাসি, ঘূর্ণি হাওয়ার মতো চোখের তারা, তার দোলা-দেওয়া চলার ছন্দ—মংলার মনটাকে কেমন যেন উতলা করে দিয়ে গেছে।

তার সমস্ত শরীর জুড়ে যেন সমুদ্রের ঢেউএর এক দুঃসহ মাতামাতি। প্রচণ্ড জোয়ারের আবেগে একটা সুডোল ঢেউ তার বুকের ওপর ফুঁসে উঠেছে।

তার ঠিক নিচেই ঢেউএর পরের এক নিঃশব্দ গভীরতা।

কাঁকালের ওপর থেকে নিচের দিকে আবার একটি ঢেউএর উত্থান ও পতন।

মংলার সমস্ত শরীর তোলপাড় করে একটা ঘূর্ণি হাওয়া বয়ে গেল।

ময়না বউ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মংলাকে একটা ঠেলা দেয়ঃ এ্যায়!

মংলার ভাবনা যেন একটা পাথরে হোঁচট্ খেয়ে আহত বেদনায় মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল।

চোখ মেলে একবার সে তাকালো। তারপর চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে পড়ে থাকে।

ঃ এ্যায় !

ঃ ক্যানে ?

ঃ ঘরে জল নেই এক ফোঁটা। এক ভার জল এনে দে—

ঃ হুঁ—

ঃ হুঁ কি ?

মংলা একটু চুপ করে থেকে বলেঃ কাজের বেলা আমাকে দরকার ; কাজ হয়ে গেলে আর কেউ লয়।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ময়না বউ।

কে বলবে যে, সে আজ সমুদ্র থেকে মংলার ওপর ভীষণ রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ফিরেছিল।

সমস্ত শরীরটা তার হাসির তোড়ে দোল খেতে থাকে।

মংলা চোখ খুলে তাকায়।

ছুঁড়িটা বেশ, লয় রে ?

মংলার চোখটা কেঁপে ওঠে। বুকের ভেতরটা মোচড় খায়।

কিছুই ময়না বউর নজর এড়ায় না।

কিন্তু ময়না বউ তার মনের খবর পেল কি করে ? কি করে সে বুঝলো যে, সেই মেয়েটাকে ঘিরে তার সব ভাবনা সারাক্ষণ ঢেউ ভাঙছে ? আর যাই হোক, ময়না বউর মনকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। বড়ো চতুর মন ওর।

ময়না বউ হাসতে হাসতে বলে : কেমন ধারালো ডুটো চোখ, বুক-তোলপাড়-করা শরীল, কেমন মন-পাগল-করা হাসি—

মংলা উঠে বসে।

ময়না বউ হাসতে থাকে। তারপর সুর করে গায়—

যোবতীর অঙ্গে কতো লিশা

কিছু নাহি জান।

মংলা ময়না বউর ডুটো চোখের দিকে চেয়ে দেখে। সেখানে পলাশ বনের ঘনীভূত রহস্য জমাট বাঁধছে।

: ধর্, ওকে যদি তোর বউ করে আনা যায়, তা'লে কেমন হয় বল্ দি নি ?

: ধেৎ—

মংলা রোদ্দুরে বিছানো জালটার দিকে চেয়ে থাকে।

হাসতে হাসতে ময়না বউ বলে : বেশ হয়, লয় রে ?

মংলা বলে : দে, কলসী আর সিকে বাঁকটা এনে দে—

ময়না বউ ঠায় বসে থাকে।

ঃ পরথম জোয়ার এয়েচে শরীলে। সেই জোয়ারে হাবুডুবু খেতে কী সুখ—

ঃ যাবোনা তা'লে জল আনতে।

ময়না বউ বলে চলে ঃ ছুঁড়ির অঙ্গে কি তেজ! যেন পলাশ বনের গনগনে আগুন।

মংলা উঠোনে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘরের ভেতর থেকে সিকে-বাঁকটা বের করে এনে দুপাশে দুটো কলসী বসিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায়।

ময়না বউ হাসতে হাসতে বলে ঃ দেখিস্, বুকের আগুনের জ্বালায় কলসীটা ভাঙিস না যেন।

মংলা চোখের আড়ালে চলে গেলে ময়না বউর মুখটা ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে ওঠে। সামনের বালিয়াড়ির নীরবতার মতো থম্ থম্ করতে থাকে তার সারা মুখটা। দু চোখের পলাশ বনের গভীর রহস্য।

বিকেলের কাজ অনেক পড়ে আছে তার। সারা হয়নি। তার এখনি উঠে পড়া দরকার। কিন্তু সে কিছুতেই উঠতে পারছে না। এক আশ্চর্য জড়তায় তার সমস্ত দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বিকেলের রোদ্দুরে নারকেল গাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। এক গভীর বিষণ্ণতার মতো জালটা ছড়িয়ে পড়ে আছে উঠোন ময়। তার ওপরে মুরগীগুলো বালি ঠুকরে কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ সাঁড়া মোরগটা একটা সাঁড়ির দিকে মাটিতে ডানা আঁচড়ে ছুটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সাঁড়ি ককিয়ে উঠলো।

ময়না বউ মনে মনে একটু হাসলো।

হিংসে হয়েছে সাঁড়ির।

অন্য সাঁড়ির পেছনে সাঁড়াটাকে ছুটতে দেখে হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে। সাঁড়িটা শুধু ককিয়েই ক্ষান্ত হলো না। দৌড়ে গিয়ে সাঁড়াটাকে তার ঠোঁটদিয়ে কয়েকটা ঠোকর মারলো। তাতে সাঁড়াটা একটু পিছিয়ে

পড়তেই সে হিংসের জ্বালায় লম্বা লম্বা পা ফেলে সাঁড়াটাকে ধরে তাকে তার ঠোঁট আর নখের ধার কতোখানি তা বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লো।

সাঁড়িটার কাণ্ড দেখে ময়না বউ অবাক হয়ে গেল। সাঁড়ির কী হিংসেরে বাবা!

ময়না বউর মুখটাও কঠিন হয়ে ওঠে।

নারকেল গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়। রোদ্দুর থম্ থম্ করে কাঁপছে বালিয়াড়ির মাথায়। বালিয়াড়ির ওপারে সমুদ্র অকস্মাৎ গর্জে উঠলো।

ময়না বউ ঠায় বসে রইলো।

সে যে কতক্ষণ সেইভাবে বসেছিল, সে জানে না।

জলের কলসী বাঁকে নিয়ে মংলা ফিরে আসতেই সে বুঝতে পারলো, তার আর বসে থাকা ঠিক নয়।

এবার সে উঠে পড়ে।

তাকে একবার টেকো পাত্রের দোকানে যেতে হবে। তেল আর লঙ্কা হলুদ আনতে হবে। রাঘবের জন্য তামাক।

ঃ পয়সা দে, দোকানে যেতে হবে।

মংলা দাওয়ায় বসে বলেঃ পয়সা তো তোর কাছেই। আমি কি জানি?

ময়না বউ ঘরের ভেতর থেকে পয়সা আর একটা দড়িবাঁধা খালি শিশি হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসে।

ঃ বসে থাকবি। বুঝলি? কুথাও যাবি নি।

ময়না বউ উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। তার দু চোখে বোশেখের পলাশবনের রক্তিম আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

ময়না বউ চলে গেলে মংলা কিছুক্ষণ একা একা দাওয়ায় বসে জিরোলো। তারপর আকাশের রং বদ্‌লানো নিজের মনে দেখতে লাগলো।

তারি ফাঁকে মনে ভেসে ওঠে দুপুরের মাছমারি চরের ছবি।

সব ছবিকে ম্লান করে দিয়ে একটি ছবি বড় বেশি উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায়।

মেয়েটা কে? তা তো জানা হয়নি মংলার।

মৈনিমাসির কেউ হবে নিশ্চয়। কিন্তু কে হয় মৈনিমাসির?

কখনও সে আসে নি মাছমারির চরে। মাছমারির চরে সে তো কখনো এর আগে ও মুখ দেখেনি। কাল আবার সে সমুদ্র থেকে ফিরে এসে তার মুখ দেখতে পাবে তো? যদি সে আর না আসে? যদি তাকে মৈনিমাসি আর সঙ্গে না আনে? তাহলে হয়তো কোন-দিন তাকে সে আর দেখতে পাবে না।

সেই ঢেউ তোলা শরীর, সেই বুক-চিরে-বসা চোখ। সে হয়তো আর কখনো দেখবে না।

তার মনে হয়, গভীর সমুদ্র থেকে মাছমারির চরের ওপর একটা নিটোল ঢেউ উঠে এসে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। তারপর চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

আর কি সে ফিরবে?

উঠোনের কোণ থেকে মোরগটা কি ভেবে হঠাৎ গলা ছেড়ে ডেকে উঠলো। মংলার বুকের ভেতরটাও যেন সেই সঙ্গে চিৎকার করে উঠতে চাইছে?

কিন্তু কি নামে সে ডাকবে তাকে? কি তার নাম? তাও তো জানা হয় নি তার।

সূর্য পলাশ বনের আড়ালে চলে গেল।

ঈষৎ লালচে হয়ে আসছে আকাশটা। আরো রং বদ্‌লাবে।

গাঢ় লাল আলোয় স্নান করবে আকাশ ও সমুদ্র।

ময়না বউ হাসতে হাসতে ফিরে এলো। টেকো পাত্রের দোকান

থেকে যা যা আনবার সে এনেছে। সেই সঙ্গে সে এনেছে একটা নতুন খবর। জিনিসগুলো ঘরের ভেতরে রেখে সে বেরিয়ে এসে মংলার পাশে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। নিজের মনে খিল খিল করে হেসে উঠলো সে।

ঃ কি হয়েচে? হাসচিস যে?

ঃ রাস্তায় আসতে আসতে ঘনাই মোড়লের বউ একটা কথা বলেচে—

ঃ কি কথা?

ময়না বউ হাসি বন্ধ করে। কিন্তু ভেতরে তার হাসি ঢেউ ভাঙছে।

ঃ আষাঢ় মাসের পরে তোর সাথে নাকি আমার বে হবে।

হাসতে হাসতে ময়না বউ মংলার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে।

পরের দিন মৈনিমাসি এলো না।

তারপরের দিনও না।

দুপুরে মংলা সমুদ্র থেকে ফিরবার সময় খুঁজলো একটি আকাঙ্ক্ষিত মুখ। দু দিনই খুঁজলো। কিন্তু পেল না।

যে মৈনিমাসিকে এতদিন সে অবাঞ্ছিত মনে করেছে, সেই মৈনিমাসি আজ তার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত জন। তার দেখা না পেয়ে সে ক্লান্ত মনে মুখ শুকিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

পায়ের তলার সংক্ষিপ্ত ছায়াটার মতো তার সকল অনুভূতি যেন এক জায়গায় গুটিয়ে জড়ো হয়।

সে কি তাহলে আর মাছমারির চরে কোনদিন আসবে না?

সেই ঢেউ তোলা শরীর, সেই বুক-চিরে-বসা চোখ!

ময়না বউ খুশি হয়েছে।

বুধিয়া ভাবে, পলাশবন থেকে যে গন্ধববুনিটা বেরিয়ে এসেছিল, সে বুঝি আবার পলাশ বনে ফিরে গেছে।

সেদিন বিকেলে ময়না বউ জিজ্ঞেস করলো : কিরে, অমন মুখ শুকিয়ে রয়েচিস ক্যানে? সারাক্ষণ কি ভাবিস্ বল্ দি'নি?

মংলা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে : তোর তাতে কি দরকার?

ময়না বউ চাপাহাসিতে ঢেউ তুলতে থাকে। বলে : ডর পেয়েচিস তুই?

: ডর? ডর ক্যানে?

: আবার ক্যানে? আমাকে বে করতে হবে ভেবে ডর পেয়ে গেচিস তুই, লয় রে?

হাসিতে ময়না বউ দু চোখে একটা ঝিলিক খেলে যায়।

মংলা জিজ্ঞেস করে : কি করে জানলি তুই?

: সে কি? তুই জানিস না। গাঁর সব্বাই যে জানে।

চরের ওপর ভেঙে-পড়া ঢেউএর মতো ময়না বউ হেসে কুটি কুটি হয়।

: তোর বিয়ে। আর তুই জানিস না?

মংলা কি বলবে, বুঝে উঠতে পারে না। সে শুধু চেয়ে চেয়ে ময়না বউকে দেখতে থাকে।

: যা-ই বল্। তুই জিতে গেলি—

মংলা নীরব।

: বুলানটা একদম ঠকে গেল।

চমকে উঠে মংলা ময়না বউর মুখের দিকে তাকায়।

ময়না বউর চোখের তারা দুটো কেঁপে ওঠে। চোখে বালি উড়ে পড়লে যেমন হয়, তেমনি কর্কর্ করতে থাকে তার ভাসা-ভাসা দুটি চোখ।

সে উঠে ঘরের ভেতরে চলে যায়।

কি চায় ময়না বউ? কি বলতে সে চায়? তার মনের গোপন গভীরে সে কোন্ ইচ্ছেকে লালন করেছে?

মংলা কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু মংলা জানে, ময়না বউ সমুদ্রের একটা খেয়ালী ঢেউ। যে এগিয়ে আসে, ধরা দেয়; কিন্তু

দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরলে হাত দুটিই শুধু ক্লান্ত হয়। হাত ভরে না। হাত দুটিকে শূন্য রেখে সে কখন ফিরে চলে যায়, জানা যায় না।

ময়না বউকে চেনা যায় না।

ময়না বউকে সে কোনদিনই চিনতে পারলো না।

সেদিন সমুদ্র থেকে ফেরবার সময় ডিঙি থেকে চরের ওপর চোখ পড়তেই মংলার বুকটা হঠাৎ নেচে উঠলো। হাল ধরে বসেছিল সে। পেছন থেকে একটা ঢেউ বিপুল তাড়নায় ডিঙিটাকে ঠেলে সোহাগীর সামনে এনে ভিড়িয়ে দিল।

বেপারিরা ছুটে এলো।

মংলা কোন দিকে না তাকিয়ে সোহাগীর দিকে এগিয়ে যায়। ডাকে : এ্যায়—

সোহাগী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

: এ্যায়, শুনচিস—

সোহাগী মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

: এ্যায় কি ? নাম ধরে ডাকতে পারিস্ না ?

মংলা ঘাবড়ে যায়। কিন্তু বুকের নিচে একটা ঘূর্ণি ঝড় ঘুরপাক খেতে থাকে।

: তোর নাম কি, আমি কি তা জানি ?

: ক্যানে ? সুহাগী—সব্বাই জানে।

: বড্ড মিষ্টি নাম তো ?

: গুড়ের মতো। লয় ?

মংলা হেসে ওঠে। জিজ্ঞেস করে : মৈনিমাসি তোর কে ?

: আমার মাসি—

: ওকে ডাক। ভালো মাছ রয়েচে—

সোহাগী ডাক দেয়ঃ মাসি, মাসি, ইদিকে আয়। ভালো মাছ রয়েচে—

মৈনিমাসি ওদিকে কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। আগেকার মতো সে আর ঝগড়া করতে পারে না। জ্বরে মৈনিমাসিকে বড়ো দুর্বল করে দিয়েছে।

তবু তার তেজ কমে নি।

সে আবার দুদিন জ্বরে পড়েছিল। তাই মাছমারির চরে তাকে দুদিন দেখা যায় নি। জ্বর ছাড়তেই সে আজ সোহাগীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

দুপুরের রোদ অসহ্য লাগছে তার। তাই মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে সে ঘুরছে। তারি মধ্যে আবার বেপারিদের সঙ্গে ঝগড়াও করতে হচ্ছে তাকে।

সোহাগীর ডাক শুনে মৈনিমাসি ঝগড়া ফেলে রেখে এদিকে চলে আসে।

মংলার ডিঙির মাছ দেখে সে খুশি হয়। না, সোহাগী মাছ চিনতে শিখেছে। কোন্ মাছ দু পয়সা কমে কিনে দু পয়সা বেশিতে বিক্রি করা যাবে, তা এরই মধ্যে সোহাগী শিখে ফেলেছে।

ঃ মাছ ভালো নয়, মাসি ?

সোহাগীর কাঁধের ওপর হাত রেখে মৈনিমাসি ফিস্‌ফিস্ করে বলেঃ ওদের সামনে ভালো বলতে নেই। ভালো বললেই দাম বেশি হাঁকবে।

তারপর মংলার দিকে চেয়ে বলেঃ অ, এই মাছ। কতো লিবি, বল্ ?

মংলা বলেঃ তুই বল্ মাসি, কতো দিবি ?

মৈনিমাসি বলেঃ পাঁচ টাকা—

মংলা বলেঃ না, চার টাকা—

চারটাকা! অবাক হয়ে যায় মৈনিমাসি। এতদিন সে ব্যবসা

করে আসছে। দশটাকার মাছ পাঁচ টাকায় কিনতে তার মতো কেউ পারে না। কিন্তু সে যেমাছ পাঁচ টাকায় কিনতে প্রস্তুত, তা চার টাকায় কেউ দিতে চাইবে—এ অভিজ্ঞতা আজ তার একেবারে নতুন।

মৈনিমাসি সোহাগীর দিকে চেয়ে চোখ ঠারে।

ঃ চার টাকা দিয়ে দে—

কাপড়ের খুঁট থেকে টাকা বের করে সোহাগী মংলার হাতে দেয়। একটা ঢেউ তীরের বেগে ছুটে এসে সোহাগীর হাঁটুর ওপরের কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে যায়। ভয় পেয়ে সোহাগী ডিঙির ওপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মৈনিমাসি শুকনো বালির ওপর দাঁড়িয়ে বলে ঃ

ঃ ঝাঁকায় মাছগুলো তুলে দে।

মংলা ঝাঁকায় মাছগুলো তুলে দিল।

সোহাগী কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নেয়। ঝাঁকা মাথায় এবার ছুটতে হবে। দীর্ঘ পথ পড়ে আছে তার প্রতীক্ষায়।

দূর থেকে মৈনিমাসি মংলাকে ডেকে বলে ঃ এই ছোঁড়া, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস ? ঝাঁকাটা ওর মাথায় তুলে দে'না।

মংলা সোহাগীর মাথায় ঝাঁকাটা তুলে দেয়।

সোহাগী ঝাঁকাটাকে মাথায় ঠিক করে বসাতে বসাতে বলে ঃ তোর আজ খুব ক্ষেতি হয়ে গেল, লয়রে ?

ঃ হুঁ ? একটু ক্ষেতি হলো।

ঃ ক্ষেতি হলো তো দিলি ক্যানে ?

ঃ লাভ হবে ভেবে—

মংলা হাসতে থাকে। সোহাগীর মুখেও হাসি খেলে যায়।

ঃ লাভ হবে ভেবে ?

বালির ওপর থেকে মৈনিমাসি ডাক দেয় ঃ দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে ? চলে আয়—

সোহাগী চলে যায়। দু'পা গিয়েই পেছন ফিরে তাকায়।

ঃ নামটা কি তোর মনে রয়েচে তো ?

ঃ হুঁ ; সুহাগী—

খিল খিল করে হাসতে হাসতে সোহাগী চলে যায়।

মংলা সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, সোহাগী হাসলে তার গালে কি সুন্দর টোল পড়ে। যখন চলে যায়, তখন কেমন সুন্দর লাগে তাকে দেখতে। আবার যেতে যেতে যখন ফিরে তাকায়, তখন তাকে আরো সুন্দর দেখায়। তার কাছে সোহাগীর সবই সুন্দর।

ময়না বউ জলের ঘটি নিয়ে এগিয়ে আসে। মংলার হাতে জলের ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে সে বলে ঃ আজ আবার এয়েচিল ?

মংলা জিজ্ঞেস করে ঃ কে ?

ঃ পলাশ বনের সেই গন্‌গনে আগুন।

মংলা হেসে ওঠে। কিন্তু ময়না বউ হাসতে পারে না।

বুধিয়া ভাবে, পদ্মবুড়ি ঠিকই বলেছিল। গায় ওঁদের হাওয়া লাগ্‌লে আর রক্ষে নাই। দামী মাছ জলের দামে যায় বিকিয়ে—

ঃ হবে নি, হবে নি ওসব। আমার বংশে ওসব নাই—

রাঘব তার চোখ দুটো গোল গোল করে ঘনাইর মুখের সামনে হাত নেড়ে স্পষ্টই বলে দেয়।

ঘনাই রাঘবকে ভালোভাবেই জানে। সে একটুও বিচলিত হয় না। বলে ঃ তোর বংশে না থাক্‌, গাঁয়ে তো আছে। আমাদের জাতে তো আছে। তুই কি জাতের বার ?

ঃ ওসোব আমি জানিনা। এক পোর বউর সাথে আরেক পোর বে দিতে আমি পারবো নি। এ বে আমি দেব নি। হ্যাঁ—

রাগে রাঘবের গলা থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজই শুধু বেরিয়ে এলো।

ঘনাই নাছোড়বান্দা।

সে বলে ঃ ময়না বউর মারও তো এমনি বে হয়েছিল। সে কথা তো তুই জানিস্। জেনে শুনেও তার মেয়ের সাথে তোর ছেলের তো বে তুই দিয়েচিস।

রাঘবের গলা গর্জে ওঠে ময়না বউর মার এমন বে হয়েছিল, তাতে আমার কি ? আমার ঘরে এমন বে হয় নি, হবে নি।

একটু থেমে রাঘব বলে ঃ ময়না বউর মা তেমন বে-তে রাজি হয়েছিল, বে হয়েছিল। কিন্তু আমি তো ময়না বউকে আজ বারো বছর দেখে আসচি। ময়না বউ এমন বে-তে রাজি হবে নি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনাই বলে ঃ রাজি আছে।

ঃ রাজি আছে ?

রাঘবের গলার স্বরটা হঠাৎ বদ্‌লে যায়।

কপালে একসঙ্গে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো। যেন অনেকগুলো ঢেউ বেলাভূমির ওপর এগিয়ে এসেছে। এখুনি ভেঙে পড়বে।

ঃ ময়না বউ এমন বে-তে রাজি আছে ?

ঘনাই হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে।

ঃ তুই জানিস ?

ঘনাই মাথা নাড়তে থাকে।

ঃ কেমন করে জানলি ?

ঃ আমার বউর কাছে ও বলেচে।

ঃ না !

হঠাৎ রাঘবের গলা ফেটে পড়ে যেন।

ঃ ! ও হতে পারে না ময়না বউ, অ ময়না বউ—

ঃ ক্যানে ?

বাঁশের দরজার আড়াল্ থেকে ময়না বউর গলা শোনা গেল।

ময়না বউ তাহলে দরজার আড়াল থেকে এতক্ষণ সব শুনেছে ?

ঃ এদিকে শোন্—

ময়না বউ বেরিয়ে আসে।

রাঘব কি ভাবে একটু। তারপর বলে : না। যা তুই—

ময়না বউ চলে যায়।

না, ময়না বউকে কিছু বলবার তার নেই। জিজ্ঞেস করবারও কিছু নেই।

: কিন্তুক—

: রাঘব একটু থামে।

: কিন্তুক এই বারো বছর আমি ওর এক টুক্‌রা হাড় কি একগাছা চুল—কিছুই যে পাই নি রে। অনেক খুঁজেচি আমি। সারাদিন বালিতে খুঁজে খুঁজে ফিরেচি। তুই কি বলিস রে ঘনাই—

শেষের দিকের কথাগুলো তার ভারি হয়ে আসে।

ঘনাই একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে : ওর আশা তুই ছেড়ে দে মোড়ল।

আবার রাঘবের গলাটা ফুঁসে ওঠে : কি? বুলান নেই? তুই কি বলিস্, ঘনাই—

ঘনাই মুখে একরকম চক্‌চক্ শব্দ করে মাথা নাড়ে।

: কিন্তুক আমার মন বলচে, ও আছে। ও আবার ফিরে আসবে। কোথাও ডাঙা খুঁজে পেয়েচে ও।

রাঘব তার বিশ্বাসে অবিচল।

ঘনাই চলে গেলে তার মনটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল।

ঘনাই তাকে মনে মনে আজ কেমন দুর্বল করে দিয়ে গেল।

ময়না বউ মংলাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সে একথা বিশ্বাস করবে কি করে? ঘনাই কি তাহলে তাকে মিথ্যে কথা বলে গেল? এটা কি তাহলে তার মনগড়া বানিয়ে-তোলা কথা?

: ময়না বউ—

রাঘব ডাকে।

একটা করুণ মূর্তির মতো ময়না বউ ঘর থেকে বেরিয়ে তার

সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মুখের দিকে চেয়ে রাঘব কোন কথা বলতে পারে না।

মনটাকে ঠিক করে নিয়ে সে বলে : তুই বলেচিস্?

ময়না বউ বালিয়াড়িটার দিকে চেয়ে বালিয়াড়ির মতো নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে যায়।

: ঘনাইর বউকে তুই বসেচিস ?

উঠোনের মুরগীগুলো কি দেখে যেন ডাক হাঁক করে উঠলো। ঘরের চালের ওপর দিয়ে বাতাস হাহুতাশ করে কেঁদে গেল। নারকেল-গাছগুলো সমবেদনায় মাথা দুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

: চুপ করে রইলি ক্যানে? বল্—

: বলেচি—

: বলেচিস্?

না। ময়না বউকে তার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। বারো বছরে ময়না বউ বুলানের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছে।

তাকে আর তার কিছুই বলবার নেই।

লাঠিতে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। ঠক্ ঠক্ করে কিছুটা গিয়ে সে আবার ফিরে এলো।

: কিন্তুক—

রাঘব একটু দম নিল।

: কিন্তুক আমি জানি, কোথাও ডাঙায় উঠেচে ও।

: তাহলে বারো বছরে ওর ঘরে ফেরবার কথা একবারও মনে হলো নি?

ময়না বউর গলাটা কাঁপছে।

রাঘব আর কিছু বলার আগে সে এক দৌড়ে ঘরের ভেতরে হারিয়ে যায়।

রাঘব কঠিন মুখে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তার কপালের ভাঁজের সংখ্যা যেন আরো বেড়ে যায়।

গাঁয়ে সব জানাজানি হয়ে গেল।

কিন্তু কেউ অবাক হলো না। এই রীতি ওদের সামনে প্রচলিত। সবাই আশ্বস্ত হলো, আনন্দিত হলো। গাঁয়ে তাহলে একটা উৎসব হবে। নাচগান হৈ-হুল্লোড়ে একটা দিন তাদের টইটম্বুর হয়ে উঠবে।

সেই সঙ্গে মাছমারির জেলেদের কাছে আর একটা কথাও জানাজানি হয়ে গেল।

সোহাগী নাকি কবে মংলাকে পান দিয়েছে। কে নাকি তা দেখেছে।

পান-দেওয়া হলো ওদের সমাজে ভালবাসা ও হৃদয় নিবেদনের চিহ্ন।

পান দিয়ে এদিককার জেলে-যুবতীরা যুবকদের কাছে ভালোবাসা জানায়। তারপর জেলে-যুবক মেয়ের বাপের কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখে। মেয়ের বাপ দাওয়ায় গম্ভীরভাবে বসে জানাবে তার দাবি-দাওয়ার কথা। টাকা আর কাপড়-চোপড়ের দাবি।

দিন স্থির হয়।

দাবি মিটিয়ে দিলে মেয়েকে বিয়ের আসরে বের করা হবে। বিয়ে হয়ে গেলে খাওয়া দাওয়ার পালা।

তারপর সারারাত ধরে নাচ-গান আর হৈ-হুল্লোড়।

সোহাগী মংলাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

কথাটা মাছমারির জেলে ছোকরারা জেনে ফেলেছে। তারা এই নিয়ে কতো রঙ্গ-রসিকতা করেছে। মংলা তাতে কানই দেয় না। সে নিজের মনে ডিঙিতে যায়, মাছ ধরে আনে, বিক্রি করে ঘরে ফিরে আসে।

সোহাগী আর মৈনিমাসির সঙ্গে মাছ নিতে আসে না। মৈনিমাসির জ্বর সেরে গেছে। শরীরও একটু সেরেছে। তাই আর সোহাগীকে সঙ্গে আনবার তার প্রয়োজন নেই।

না-আসায় সোহাগী বেঁচেছে। কদিন সবাই মিলে তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে।

না। সে আর মাছমারির চরে কথনো মাছ নিতে আসবে না। মংলা কতোদিন সোহাগীকে দেখে নি। সোহাগীর মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সমুদ্রের জলে আলোর ঝিকিমিকির মধ্যে তার মিল সে খুঁজে পায়।

সমুদ্রের ঢেউএর দিকে তাকালেই সোহাগীর চেহারাটা তার মনে পড়ে যায়।

ময়না বউ মংলাকে জিজ্ঞেস করে : ও আর আসে না?

মংলা তার মুখের দিকে তাকায় : কে?

: সেই গন্‌গনে আগুন—

: এলে দেখতে পেতিস।

: আ—রাগ করচিস ক্যানে?

মংলা চুপ করে থাকে।

ময়না বউও একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে।

: জষ্ঠিমাস শেষ হতে আর ক দিন বাকি রে?

মংলা একটু ভেবে বলে : পাঁচ দিন।

: আর পাঁচটা দিন পাঁচটা রাত কেটে গেলে আষাঢ় মাস, লয় রে?

: হুঁ—

মংলা সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

: আষাঢ় মাস গেলে—

কথার মাঝখানে ময়না বউ হঠাৎ থেমে যায়।

মংলা হেসে বলে : আমার সাথে তোর বে।

ময়না বউ মংলার কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ওঠে।

: তোর আর তর সইচে নি, লয় রে?—

মন ছম্‌ছম্‌ করেন

লাগর, বুক ছমছম করেন···

সুর করে গাইতে থাকে ময়না বউ।

অমনি বালিয়াড়ির দক্ষিণ দিক থেকে একটা বাতাস উঠে এসে নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে খেলা করে বয়ে যায়।

দূরে রাঘবকে ঘরে ফিরতে দেখে ময়না বউ গান বন্ধ করে আড়ালে সরে যায়।

মংলা উঠোনে দাঁড়িয়ে সূতোয় পাক দেয়।

একটু পরেই রাঘব এসে উঠোনে পৌঁছোয়।

মংলা রাঘবকে লক্ষ্য করে বলে ঃ ভাঙা ডিঙিতে আর বেশি দিন চলবে নি। ঝড়জলের দিন আসচে—

রাঘব দাওয়ায় বসে একটু দম নেয়। বলে ঃ মহিষাজোড়ে যেতে হবে তাহলে—

ঃ কে যাবে ?

ঃ কে আবার যাবে ? তুই যাবি—

ঃ আমি যাবো নি ওই চামচিকের কাছে।

ঃ তাহলে কে যাবে ? আমাকে এবার তোরা বাদ দিয়ে দে। কুনো কাজ আমাকে দিয়ে হবে নি। নিজেদের ঘর সোংসার নিজেরা বুঝে লে—

রাঘবের মুখটা থম থম করতে থাকে অভিমানে।

ঘরের ভেতরের দিকে একবার রাঘব তাকায়। তারপর নিজের মনে বলে ঃ আমি আর তোদের ঘর সোংসারের কুনো কথায় নাই। বুঝলি ?

মংলা সূতোয় পাক দিতে দিতে উঠোন পেরিয়ে বালিয়াড়ির দিকে চলে যায়। রাঘব দাওয়ায় নিঃশব্দে বসে থাকে। তার দু চোখে যেন এক আকাশ রোদ্দুর থম্ থম্ করছে।

ভোরের দিক থেকে আকাশটা মেঘ্লা করেছিল

আষাঢ় সুরু হতে আরো কয়েকদিন বাকি। তবু তার আগেই মেঘ দেখা দিল। সারা আকাশের রংটা ধূসর হয়ে আছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই।

তারি মধ্যে সূর্য উঠলো।

আকাশটা উজ্জ্বল হয়ে সমুদ্রের জলে মুখ রাখলো। পাখির মালা মাঝ-সমুদ্রে ভেসে চললো। সেই সঙ্গে মাছমারি গাঁয়ের ডিঙিগুলোও ঢেউএর মুখে দুলে উঠলো।

মংলা আর বুধিয়া সমুদ্রে গেল।

রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে সমুদ্রের চরে নিজের মনে ঘুরে বেড়ালো।

ময়না বউ ডুবে গেল তার নিত্যকার কাজের ভিড়ে।

মেঘে মেঘে বেলা হলো। এলো জোয়ারের বেলা।

দুপুরের দিকে বালির চর জোয়ারের আবেগে মাতাল হয়ে উঠলো।

পচা মাছের গন্ধ নোনা জলের গন্ধের সঙ্গে মিলে মিশে বাতাসটাকে ভারি করে তুললো।

সেই সঙ্গে আকাশের বুকটাও মেঘে মেঘে ভারি হয়ে উঠলো।

আকাশে মেঘ দেখলে সমুদ্রও মাতাল হয়ে ওঠে। জোয়ারের সময় সেই মাতলামি আরো বেড়ে যায়।

মাতাল ঢেউগুলো পর-পর ডিঙিয়ে মাছমারি গাঁয়ের ডিঙিগুলো একে-একে ফিরে এলো। চরের ওপর ভিড় জমলো, ভিড় ভাঙলো। ডিঙিগুলো বালির ওপর গা ছেড়ে দিয়ে পড়ে রইলো।

মংলা ভাত খেয়ে কাঁধে একটা ফতুয়া ফেলে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ময়না বউ জিজ্ঞেস করে ঃ কুথায় যাচ্চিস ?

মুখ না ফিরিয়েই মংলা বলে ঃ মহিষাজোড়ে। গোকুল গায়েনের কাছে। ফিরতে রাত হবে।

ঃ বেশি রাত করিস নি—

: না।

দাওয়ায় বসে রাঘব সব শুনলো। মংলা বেরিয়ে যেতেই সে একটু আড়চোখে তাকে দেখে নিল। মুখটা তার আকাশের মতো ভারি আর বদ্‌মেজাজী।

মংলা তাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল। রাঘবও তাকে কিছু বললো না।

মংলা আকাশের দিকে চেয়ে মাঠ আর বনের রাস্তাই ধরলো।

সত্যি, ডিঙিটাতে আর চলছে না। দিনে দিনে ঝাঁঝরা হয়ে আসছে ওটা। খুলে খুলে যাচ্ছে তক্তাগুলো। মাঝে মাঝে ফাটল বেরিয়ে পড়েছে। ওগুলোর ভেতর দিয়ে জল ঢুকে পড়ে। জল সেঁচে ফেলে দিতে হয়।

মংলার ভয় হয়, কোনদিন হয়তো ডিঙিটা ডুবে যাবে। কিংবা ঢেউএর দাপট্ সহ্য করতে না পেরে তক্তাগুলো খুলে খুলে কোথায় ভেসে যাবে। বুলানের মতো তারাও হয়তো একদিন সমুদ্র থেকে ফিরতে পারবে না।

ক বছর হলো তারা গোকুল গায়েনকে বলে আসছে, ডিঙিটাকে সারিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু গোকুল একেবারে গা করছে না। ডিঙিটাকে সারাতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে যে। টাকা খরচ করার কথা গোকুল শুনতে চায় না।

এত বড় কঞ্জুস্ এ অঞ্চলে একটাও নেই। গোকুল সব কথা শুনতে রাজি আছে, কিন্তু যাতে টাকা খরচের সম্ভাবনা আছে—এমন কোন কথা শুনতে সে রাজি নয়। মনোযোগ দিয়ে সব কথাই সে শুনবে, কিন্তু যেই টাকার কথা এলো, সে উঠে দাঁড়াবে। বলবে: কাজ আছে—

বিরক্ত হয়ে সে বলবে: তোদের কি টাকার কথা ছাড়া অন্য কথা নেই। তোরা সব কি রে? এ্যাঁ?

ডিঙি ঝাঁঝরা হয়ে ডুবে গেলেও তার কোন দুঃখ নেই। দুঃখ

থাকার কথাও নয়। ডিঙি সারাতে গেলে কিছু টাকা তার খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু ডিঙি ডুবে গেলে পুরো দুশো টাকা তার ঘরে আসবে। সেই সঙ্গে বছরের ডিঙি ভাড়া বাবদ দুকুড়ি টাকা।

মাঠ পেরিয়ে বন।

মাঠের রাস্তাই বেশি। এক পাশে দাঁড়িয়ে তাকালে অন্য পাশটা চোখে পড়ে না।

একটা জনহীন, জলহান সমুদ্র।

খুব জোরে হাঁটলেও পুরো দু ঘণ্টা লাগে মাঠটা পেরোতে।

বনের মধ্যে অর্জুন, নিম, নারকেল, তেঁতুল, খেজুর আর আমগাছই বেশি। বনের বুক চিরে মাথার সিঁথির মতো সরু পায়ে-হাঁটা পথ। পথের গা ঘেঁষে চোরকাঁটার উৎপাত। দুধারে বেতের বন। সরু লিক্‌লিকে কাঁটার বাহু প্রতি মুহূর্তে পথিককে রক্তাক্ত আহ্বান জানায়।

সাবধানে পথ হেঁটে মংলা বনটা পেরিয়ে যায়।

বনের পর মহিষাজোড় গাঁ।

বনের পায়ে হাঁটা-পথ মহিষাজোড় গাঁয়ের বাঁধানো উঁচু রাস্তার সঙ্গে মিশেছে।

আঁকাবাঁকা গাঁয়ের রাস্তায় উঠে মংলা মানুষের মুখ দেখলো। ইস্কুল ঘর আর গোটা কয় পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে সে গোকুল গায়েনের টালির ঘরের সামনে দাঁড়ালো।

এ অঞ্চলে টালির ঘর সচ্ছলতার চিহ্ন। কেবল সচ্ছলতা নয়, খানিকটা আভিজাত্যও বটে।

মংলা ভয়ে ভয়ে উঠোনটা পেরিয়ে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকেও দেখতে না পেয়ে জড় সড় হয়ে সে দাওয়ার একটা পাশে চুপচাপ বসে থাকে। অনেকক্ষণ সে সেইভাবে বসে রইলো। বসে বসে তার কথাগুলো সে মনে মনে গুছিয়ে ঠিক করে নেয়।

দরজাও খোলেনা, কারও দেখা নেই।

চক্‌চক্ শব্দ করে একটা টিকটিকি দেয়াল বেয়ে ছুটে গেল।

দূরে কোথায় একটা গোরু গলা ছেড়ে ডাক দিল। ইস্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কণ্ঠের অজস্র কলরবে মেঘলা বিকেলটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

উঠোনে কার পায়ের শব্দ শুনে সে পেছন্ ফিরে তাকায়।

একটা দশ-বারো বছরের ছেলে বই-বগলে ছুটতে ছুটতে আসে। মংলাকে দেখে সে বলে ঃ কাকে চাই? বাবা বাড়ি নেই।

ঃ বাড়ি নাই?

মংলার এতখানি পথ হেঁটে-আসা, এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা—সবই পণ্ডশ্রম হলো। ফোঁস্ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে হন্ হন করে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে চলে আসে।

আকাশের মতো তার মুখটা থম থম করছে।

তাহলে ভাঙা ডিঙিটা সারানো হলো না।

সেই ডিঙিটাকে তেমনি অবস্থায় নিয়ে তাকে রোজ মাঝ সমুদ্রে যেতে হবে। জল উঠবে ফুটো ফাটা দিয়ে। সেঁচে ডিঙিটাকে হাল্কা করতে হবে মাঝে মাঝে। নড়বড়ে তক্তাগুলোতে দু একটা পেরেক ঠুকে ঠিক করে নিতে হবে।

তাই নিয়ে সমুদ্রে যেতে হবে।

নইলে পেট চলবেনা যে!

আবার কবে সে মহিষাজোড়ে আসবে? যা-ই হোক, আবার একদিন তাকে আসতে হবে। তার বাপ যদি আসতো, তবে কাজটা অনেক সহজ হতো। কিন্তু সে তো আসবে না। তার যে কী হয়েছে!

সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নাই।

আকাশের দিকে চোখ পড়তেই সে চমকে ওঠে। পুব আকাশের কোণটা ক্ষ্যাপা মোষের চোখের মতো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। এখুনি বুঝি তেড়ে আসবে।

সে বনের পায়ে-হাঁটা রাস্তায় নেমে পড়ে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোবার জন্যে সে মরীয়া হয়ে হাঁটতে থাকে। বন পেরোতে সময় লাগবে। মাঠ পেরোতে পাকা দু ঘণ্টা। ঘরে পৌঁছুতে এমনিতেই রাত হয়ে যাবে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে কি আগে মাছমারি গাঁয়ে পৌঁছুতে পারবে ?

ভরসা হয় না।

তবু সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বনের সংকীর্ণ রাস্তাটাকে বিস্মিত করে এগিয়ে চলে।

কয়েকটি কাঠবিড়ালি তাকে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে পালালো। আমগাছে চড়ে ল্যাজ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘণ্টা বাজাবার সুরে তার দিকে চেয়ে ভেংচি কাটতে লাগলো। একটা খরগোশ তার সামনে দিয়ে লাফ মেরে রাস্তা ডিঙিয়ে চক্ষের নিমেষে বেতের বনের ওপাশে কোথায় ডুবে গেল। মাথাটা তার ঝিম ঝিম্ করতে লাগলো একটানা ঝিঁঝির ডাকে।

বেতের কাঁটার আঁচড় খেয়ে, পায়ের তলায় চোরকাঁটার রসিকতা মাড়িয়ে সে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে যায়।

এটা কিসের শব্দ ?

কোথায় ঢেউ ভাঙলে যেমন শব্দ হয়। হ্যাঁ, ঠিক ঢেউ ভাঙার শব্দের মতো। এখানে ঢেউ ভাঙে কোথায় ?

যাবার পথে সে তো এ রকম শব্দ শুনতে পায়নি। তবে কি এটা ঝড়ের শব্দ ? ঝড় উঠলো আকাশে ?

আকাশে তাকালো সে। না, ঝড় হয়তো উঠবে। কিন্তু দেরি আছে। সে আবার কান পাতলো। শব্দটা দক্ষিণ দিক থেকেই ভেসে আসছে।

এদিকেই এগিয়ে আসছে যেন শব্দটা।

একটা বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়লো, কে একজন গোটাদুই নারকেল

গাছের বাগ্‌লা টানতে টানতে নিয়ে আসছে। পাতাগুলো বেতের বনে, ঘাসের বনে ঘষা খেয়েই ও রকম শব্দ করছে। মংলা ভালো করে চেয়ে দেখলো, যে বাগ্‌লা দুটো টানতে টানতে নিয়ে আসছে, সে একজন মেয়ে মানুষ।

হাত দুটোতে টান পড়ায় সামনের দিকটা এক শাণিত অহংকারের মতো সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে এসেছে। মংলা কয়েকপা এগিয়ে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। বিস্ময়ের সুরে মেয়েটার মুখ থেকে বেড়িয়ে আসে ই-মা। তুই এখানে। কুথেকে এলি ?

ঃ সুহাগী।—

ঃ কোথা থেকে এলি তুই ?

ঃ তুই এখানে ক্যানে ?

ঃ বনের ওপাশে যে আমাদের ঘর।

ঃ অ, তাই নাকি ?

ঃ মংলা একবার আকাশের দিকে তাকায়। তারপর জিজ্ঞেস করে কুন্‌ দিকে ?

ঃ আমার পিছন পিছন আয়—

মংলা সোহাগীর পেছন পেছন চলতে থাকে।

কতদিন পরে সে সোহাগীকে দেখলো। মাছমারির চরে সোহাগী আর যায় না। তার শান-দেওয়া দু চোখের দৃষ্টি কতোদিন তার গভীরতাকে স্পর্শ করেনি। কতো দিন সে তার টোল পড়া মুখের হাসি দেখে নি।

মংলার বুকের ভেতর একটা প্রচণ্ড ঢেউ বারে বারে পাঁজরার ওপরে আছাড় খেয়ে যেন গুড়িয়ে যাচ্ছে।

সে সোহাগীর চলার ছন্দটা লক্ষ্য করে। তার চলার তালে তালে যেন ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে, ঢেউ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তার বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দের সঙ্গে সোহাগীর চলার ছন্দের যেন কোথায় একটা মিল আছে।

কোন কথা না বলে মংলা চলতে থাকে।

সোহাগী ঢেউ তোলে, ঢেউ ভেঙে চলে যাচ্ছে।

আর তার পেছনে যেন অন্তহীন জলের শব্দ ছড়িয়ে এগিয়ে চলেছে নারকেল গাছের পাতাগুলো।

বন পেরিয়ে উঁচু রাস্তা।

রাস্তা ধরে 'ভ্যাড়া বাঁধের' দিকে খানিকটা এগোলে বনের আড়াল থেকে একটা কুঁড়েঘর চোখে ভেসে ওঠে।

সোহাগী সেই ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশের আগল খুললো। নারকেল পাতাগুলোকে উঠোনে ফেললো। ঘর খুলে মংলাকে বসতে পিঁড়ি দিল। পান দিল।

ঃ তামুক দিতে পারবোনি।

সোহাগী হাসতে থাকে।

সোহাগীও পান খেয়েছে। ঠোঁটটা পাকা তেলাকুচা ফলের মতো লাল টুক্‌টুক্ করছে।

মংলা হেসে বলে ঃ তামুক আমি খাই না।

ঃ লিশা ভাং করিস না তুই! তুই যে এক্কেরে খাঁটি সোনা রে—

প্রশংসায় মংলা লজ্জা পায়।

সোহাগী উঠোনে নেমে নারকেলের বাগ্‌লা থেকে পাতাগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে জিজ্ঞেস করে ঃ তারপর, কুথায় গেছিলি তুই? এ্যাঁ?

ঃ গোকুল গায়েনের বাড়ি।

ঃ গোকুল গায়েনের বাড়ি? ক্যানে?

ঃ ওইতো আমাদের ডিঙির মালিক। ডিঙিটা সারাতে হবে কি-না। তাই বলতে গেছিলাম একবার।

ঃ অ—

সোহাগী পাতাগুলো ছিঁড়তে থাকে।

ঃ দেখা হলো?

ঃ না।

সোহাগী পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে গোকুল গায়েন লোকটা বড়ো বজ্জাত—ইতরেরও অধম।

ঃ ক্যানে ?

মংলা জিজ্ঞেস করে।

সোহাগী বলে চলে ঃ মাসি ওর বাড়ি মাছ বেচতে গেছে। ওকে বলে কিনা আমার একটা ঝিএর প্রয়োজন। আমাকে ঝি ঠিক করে দিবি, মৈনি ?

ঃ তারপর মৈনিমাসি কি বললো ?

ঃ ও বললো, আমি মাছের বেপার করি ঝি কুথায় পাবোরে ?

গোক্‌লা বললো, তোর একটা বোনঝি রয়েছে লয় ? ও ঘরে কি করে ? মাসি বললো, ঘরের কাজকর্ম করে। ও বললে, তাহ'লে ওকেই দে। আমার ঘরে এসে থাকুক—

সোহাগী হাসতে থাকে :

ঃ তারপর ?

ঃ মাসি তো যা মুখে আসে, তাই বলে গাল দিয়ে এলো ? মাসিকে তো তুই চিনিস—সোহাগী হাতে নারকেল পাতাগুলো ধরে হাসে আর দোল খায়।

হাসি থামিয়ে সে বলে ঃ একদিন কি হয়েছিল জানিস ? রাত্তিরে গোকলা তাড়ি খেয়ে টলতে টলতে এসে মাসিকে ডাকলো। মাসি ঘরের বাইরে আসতে ও বললো কি ঃ আজ রাত্তিরে আমি—

হাসতে হাসতে সোহাগী মাটিতে বসে পড়ে।

মংলা দাওয়ায় বসে দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে।

ঃ বললো কি না আজ রাত্তিরে আমি তোর ঘরে থাকবো।

একটু থেমে সে বলে ঃ তা তুই অমন করছিস ক্যানে ?

ঃ আমি থাকলে ওকে দুহাতে ছিঁড়ে ফেলতাম।

সোহাগী জোরে শব্দ করে হেসে ওঠে। বলে ঃ মাসি ওকে ঝাঁটা মারতে মারতে রাস্তায় রেখে এয়েছিল।

সোহাগীর গল্প শুনতে শুনতে কখন আকাশ অন্ধকার করে এসেছে, মংলা জানতে পারেনি।

সোহাগী ছেঁড়া পাতাগুলোকে দুহাতে আঁকড়ে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে যায়।

ঠিক তখনই কুঁড়ের মাথার ওপর, বনের মাথার ওপর ঝড় ভেঙে পড়লো। ধুলো উড়লো পাতা উড়লো, বনের গাছগুলো দুলতে লাগলো ঝরের আবেগে। ঘরের চাল কড়কড় করে ককিয়ে উঠলো যেন।

ঝড়ের পর মুষলধারে বৃষ্টি!

মংলা বলে ঃ কি হবে?

সোহাগী জিজ্ঞেস করে ঃ ক্যানে?

ঃ ঘরে ফিরতে হবে তো?

ঃ এটা ঘর নয়?

ঃ তা নয়, তা নয়, কিন্তুক—

ঃ কিন্তুক কি?

ঃ মৈনিমাসি কি ভাববে?

ঃ কি আবার ভাববে? তুই দাঁড়া। আমি একটু বিষ্টিতে ভিজে লিই। সোহাগী উঠোনে নেমে পড়ে। বৃষ্টিতে চুল খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকে।

মংলা চেয়ে চেয়ে দেখে।

মুক্তোর মতো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তার মুখের ওপর দিয়ে টলমল করে গড়িয়ে পড়ছে। তার কালো দুটি চোখে আকাশের মেঘের ঘনায়মান অন্ধকার। তার হাসিতে আকাশের বুক চেরা বিদ্যুতের ঝিলিক। মংলার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে।

ঃ আর ভিজিস না সোহাগী। তোর সাথে আমার আবার ভিজতে বাসনা হতেচে।

সোহাগীর গায়ের সমস্ত কাপড়টা ভিজে গেছে। লেপটে বসেছে গায়ের ওপর। শরীরের জোয়ার ভাঁটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কানায় কানায় সমুদ্র কাঁপছে টলমল করে।

মংলা চেয়ে চেয়ে দেখে।

ঃ আর ভিজিসনা সোহাগী। আমি এবার নেমে পড়ব কিন্তুক—এবার শরীর শীতল হয়েছে। কাঁপুনি লেগেছে শরীরে। সোহাগী ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঘরের ভেতরে চলে যায়।

মংলা দাওয়ায় বসে ভাবে, সোহাগী এখন কি করছে? নিজের শরীরটাকে এখন সে হয়তো মুগ্ধ চোখে দেখছে। কিংবা গায়ে শুকনো কাপড় জড়িয়ে সে হয়তো আজ নতুন করে সাজছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে সে তাকাল। কিছুই চোখে পড়লো না। অন্ধকারে আলো জ্বালেনি সোহাগী।

মংলা ডাকে ঃ সুহাগী—

সোহাগী বেরিয়ে আসে।

ঃ বল, কি বলছিস ?

ঃ আমি কি করি বল্ দি নি ?

একটু থেমে সে বলে ; আমায় একটা পেখে দিতে পারিস না ?

ঃ এই রাত্তিরে ঝড় জল মাথায় তোকে যেতে দিচ্ছে কে ? আর পেখেও ঘরে নাই।

মংলা বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে বসে রইলো।

রাতে সে তাহ'লে ঘরে ফিরতে পারবে না। তার জন্যে সবাই খুব ভাববে তাহলে। কি আর ভাববে ?, আর কে-ই বা ভাববে ? ময়না বউ ভাবতে পারে। যদি ভাবে, তাহলে দেখবে আকাশে ঝড় বৃষ্টি রয়েছে।

সোহাগী বলে ঃ বস্, আমি আলো জ্বালছি।

মংলা ভাবে, ময়না বউ আজ রাতে তার জন্যে খুব ভাবতে পারে।

কিন্তু সে একদিনের জন্যেও বুঝতে দেয়নি নিজেকে। ও কখনো

নিজেকে বুঝতে দেয়না। কখনো মনের কথা কারো কাছে খুলে বলে না। চিরকালের রহস্য হয়ে আছে সে। কখনো সে কাছে ডেকেছে কিন্তু কাছে গেলেই তাকে কঠিন আঘাতে সরিয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের চরের মতো সে ঢেউকে ডেকে আনে। আবার আঘাতে চুরমার করে তাকে ফিরিয়ে দেয়।

ময়না বউকে সে কখনো বুঝে উঠতে পারে নি।

আজ রাতে হয়তো ময়না বউ একটু ভাববে। ভাতের হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে তার পথের দিকে চেয়ে। তারপর ঝড়ের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ঘুম পাবে।

সে ঘুমিয়ে পড়বে। সোহাগী কেরোসিনের কুপী একটা জেলে নিয়ে বাইরে এলো। এদিকে বাতাসটা কম। তবু কুপীর শিস্‌টা অসহায় ভাবে নিবুনিবু হয়ে আসে। নিভেই যেতো হয়তো, সোহাগী কাপড়ের আড়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় নিভতে পারলো না।

উঠোনে ঝপঝপ শব্দ করে কে যেন এগিয়ে আসছে।

মংলা আর সোহাগী সেই দিকে চেয়ে থাকে।

না। অন্য কেউ নয়। মৈনিমাসি।

বৃষ্টিতে ভিজে মৈনিমাসি একেবারে চুপসে গেছে। ভিজে কাপড় ঝাঁকা মাথায় মৈনিমাসি কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। দাওয়ার ধারে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে : ওটা কে রে ?

মংলার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে ওঠে।

: আমি মংলা—

মৈনিমাসি খ্যাঁক করে ওঠে : কে ?

সোহাগী বলে : মাছমারির—

: কুপীটা ধর না ওর সামনে—

সোহাগীর হাসি পাচ্ছে। কিন্তু সে হাসতে সাহস পায় না।

ধীরে ধীরে মংলার সামনে কুপীটা ধরে। মংলার জড়সড় ভাব দেখে সে ফিক করে হেসে ফেলে। কপাল ভালো, হাসিটা মৈনিমাসি

শুনতে পায়নি। মংলাকে ভালো করে দেখে সে বলে : মাছমারির সেই ছোঁড়াটা ? তুই এখানে ক্যানে ? ক্যানে এয়েছেরে সোহাগী ? সোহাগী বলে : বলছি। তুই আগে কাপড় ছাড় দি'নি মাসি।

: তুই থাম্।

মৈনিমাসি তেড়ে ওঠে : আগে এর বিহিত করি, তারপর ছাড়ছি। মংলার দিকে চেয়ে বলে : ক্যানে এসেছিস বল্ ? টাকা দিয়ে মাছ নিয়ে আসি। তুই আসবি ক্যানে এখানে ? তোর তো আসবার কথা লয়।

মংলা বলে : ডিঙিটাকে সারিয়ে দিবার কথা গোকুল গায়েনকে বলতে গিয়েছিলাম। ফিরে যাচ্ছিলাম, সোহাগীর সাথে দেখা হয়ে গেল। তারপর ঝড় এসে পড়লো। তোর ঘরে এসে বসে আছি। ঝড় থামলে চলে যাবো।

শেষের দিকের কথাটা মৈনিমাসির মনে লেগেছে : হ্যাঁ। চলে যেতে হবে। রাত্তিরে এখানে থাকা চলবে নি বাপু। আমার একখানা ঘর। তায় ডাগর মেয়ে রয়েছে ঘরে—

: থাকবো নি মাসি। একটা পেখে পেলে এখুনি চলে যাই—

মৈনিমাসি সোহাগীকে জিজ্ঞেস করে ; পেখেটা কি হলো রে সুহাগী ?

: কবে ছিঁড়ে গেছে তো—

সোহাগী ঘরের ভেতরে চলে যায়। তার পেছনে পেছনে মৈনিমাসিও। যেতে যেতে মৈনিমাসি বলে : চলে যেতে হবে কিন্তুক। থাকা চলবে নি এখানে। হ্যাঁ—

অন্ধকারের দিকে চেয়ে মংলা চুপ চাপ বসে থাকে।

কি ভেবে উঠে দাঁড়ালো সে। কাকেও কিছু না বলে সে চলে যাবে নাকি ? কাঁধের ফতুয়াটা গায়ে দিল। কোঁচাকে গায়ে জড়ালো। তারপর আবার বসে পড়লো।

আকাশে শোঁ শোঁ শব্দ করে ঝড় বয়ে চলেছে।

তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টি।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

শুধু ঝড় আর একটানা বৃষ্টির শব্দ।

সোহাগী উনুন ধরালো।

মৈনিমাসি শুকনো কাপড় পরে তার পাশে গিয়ে বসলো। উনুনের তাতে একটু হাত-পা সেঁকে নিতে হবে।

কুপীর আলোয় সে সেদিনের মাছ বিক্রির পয়সাগুলো গুণলো। খানকতক নোট ভিজে চুপসে গেছে। উনুনের ধারে ওগুলো সে শুকিয়ে নিল।

তারপর সে কিছুক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

ঃ ছাখ্ তো ছোঁড়াটা চলে গেছে নি কি?

সোহাগী কুপী হাতে বেরিয়ে যায়।

মংলার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলেঃ চলে যাবি নি বুঝলি?

সোহাগী ঘরের ভেতরে যায়। বলেঃ চলে যাচ্ছেন—

মৈনিমাসি নিজেই এবার কুপী হাতে বেরিয়ে আসেঃ এত রাত্তিরে, এই ঝড়জলের মদ্দিখানে কুথায় যাবি তুই? এ্যাঁ?

মংলার মুখে কথা নেই।

মৈনিমাসি বলেঃ বললাম বলে চলে যাবি তুই? আমি মাছের বেপারি বলে কি আমার দয়ামায়া নাইরে?

একটু থামলো মৈনিমাসি।

ঃ চল্, ঘরের ভিতর চল্। একা-একা এখানে বসে কি করবি তুই? এ্যা? মংলার হাত ধরে মৈনিমাসি তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। মাদুর দিল বসতে। নিজে উনুনের ধারে গিয়ে বসলো।

কারো মুখে কথা নেই। নীরব কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে

গেল। মৈনিমাসি উনুনের আগুনের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চোখে তার পলক পড়ে না। মৈনিমাসির গভীর দুই চোখ সহসা করুণ হয়ে ওঠে।

ঃ জানিস্, আমারও একটা তোর মতোন ছেলে ছিল। তিন বছর হয়েছিল। তারপর ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে পালিয়ে গেল। গাঁয় ওলান হলো। একরাত্তিরে শেষ।

বুঝলিনি ? থাকলে তোর মতোন্ বড়ো হতো।

মৈনিমাসি চোখের কোণের পিছুটি মুছলো।

এ আবার কোন্ মৈনিমাসি ? যে মৈনিমাসিকে এতদিন মংলা দেখে এসেছে, এ যেন সে নয়। এ যেন তার কথাও নয়। এ অন্য কেউ। এ অন্য কারো কথা।

বাইরের রুক্ষতার আড়ালে এক কোমল মায়ের অন্তর লুকোনো আছে। সে কথা কি সে এতদিন জানতো ?

আজ ঝড় এলো। ঝড়ের দাপটে বাইরের সেই কঠিন আবরণটি একটা শুকনো পাতার মতো উড়ে গেছে। আর তার আড়াল থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মাতৃ-হৃদয়ের নরম করুণ মুখ।

ঃ জানিস্, আমারো একটা তোর মতোন ছেলে ছিল ?

কথাটা অনেকক্ষণ ধরে মংলার কানে বাজতে থাকে।

বাইরে ঝড়ের হাওয়ায় কথাটা ফিরে বাজেঃ থাকলে তোর মতোন হতো।

তাই হবে।

বাইরের কঠিন আঘাতেই মৈনিমাসির স্বভাব রুক্ষ হয়ে উঠেছে। আঘাত খেয়ে খেয়ে সে জেনেছে, বাইরের লোককে আঘাত দেওয়াই তার কাজ।

মৈনিমাসি আবার চোখের পিচুটি মুছলো।

সোহাগী তার মুখের দিকে চেয়ে ধমকের সুরে বলেঃ আজ

আবার ফের তুই অমন করতেছিস মাসি? আমি তাহলে একখুনি গিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বো। খাবোনি, দাবোনি। হ্যাঁ—

মৈনিমাসি নিঃশব্দে বসে থাকে।

হাঁড়িতে ভাত ফুটে এলো।

ঃ হ্যাঁরে, ওর জন্যে দুটো চাল বেশি করে নিলি নি, সুহাগী?

সোহাগী মংলার দিকে তাকায়। বলে ঃ না। থাকতে দিবার কথা হয়েছে। খেতে দিবার তো কথা হয় নি—

মৈনিমাসি সোহাগীর চালাকিতে হাসলো। আগুনের আলোয় তার হাসিটা করুণ দেখায়।

একটু পরে কি ভেবে সে মংলার পাশে এসে বসে। নিজের মনে বলে ঃ ডাগর মেয়ে নিয়ে ঘর করি। লোকজন বড় খারাপ। কু-মতলবে সব ঘুর ঘুর করে। কড়া না হলে চলে নি। বুঝলি নি?

একটু থামলো মৈনিমাসি।

ঃ একটা মাত্র ঘর। মাসি আর বুন্-ঝি-তে থাকি। তুই যখন এসে পড়েছিস, তখন যা হোক একটা তো ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার থামে মৈনিমাসি।

ঃ অভাগাটা থাকলে যা হোক একটা বেবস্থা তো করতেই হতো—

সন্ধের পর ঝড় থেমে গিয়েছিল। মেঘ পাতলা হয়ে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাও ফুটেছিল।

রাতে মংলার ঘুম হয় নি।

সোহাগীর চোখেও ঘুম ছিল না। মাসির পাশে শুয়ে সারারাত সে শুধু ছট্‌ফট্ করেছে।

ভোররাতের দিকে যখন ম্লান জ্যোৎস্না ফুটলো, একটা কোকিল বনের ভেতর থেকে ডাক দিয়ে উঠলো।

তখন দরজায় একটা ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। মংলা সেইদিকে চেয়ে ফিস্ ফিসিয়ে বলে উঠলো ঃ সুহাগী—

চুপ করতে ইশারা করে সোহাগী কাছে এগিয়ে এলো।

মংলা বলেঃ এবার তাহলে চলি সোহাগী। ডিঙি নিয়ে যেতে হবে—

ঃ যাবি ?

হুঁ—

ঃ মাসিকে বলে যাবি নি ?

ঃ তুই বলে দিস। তাহলেই হবে—

মংলা উঠে দাঁড়ালো। সোহাগী বলেঃ চল্ তোকে একটু খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি—

ঃ চল্—

রাস্তা ছাড়িয়ে ওরা বনের পায়ে হাঁটা পথে নেমে পড়ে। খানিকটা পথ এগিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে যায়। সামনে পথ বন্ধ। একটা আমগাছের মোটা ডাল কাল রাতের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। একটা নেউল তাদের পাশ দিয়ে ছুটে পালালো।

পরে সোহাগী মংলার একটা হাত চেপে ধরে। মংলা তাকে তার বুকের ওপর টেনে আনে।

সোহাগীর সমস্ত চেতনা যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসে। কিছু বলার ক্ষমতা আর তার থাকে না।

গাছের মগডালে একটা পাখি তার ভিজে ডানা দুটো ঝাপটিয়ে জল ঝেড়ে নিল।

মংলা বলেঃ তুই এবার ফিরে যা সুহাগী—

সোহাগী ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে

ঃ আবার আসবি তো তুই ? বলে যা—

ভিজে বনের পাতা থেকে জল ঝরিয়ে দিয়ে একটা গভীর হাওয়া বয়ে যায়।

ঃ আসবো।

একটু থেকে সে বলেঃ আসতেই তো হবে। ডিঙিটা না সারালে একদম চলছে নি—

ঃ তাহলে যা—

কথায় কথায় অনেকখানি পথ তারা চলে এসেছিল। সোহাগীকে একা যেতে হবে বনের এতটা পথ। এখনো ভোর হয়নি। পৃথিবীকে এখনও আঁধার জড়িয়ে আছে।

মংলা সোহাগীকে জিজ্ঞেস করেঃ এতটা পথ তুই একা যেতে পারবি তো?

ঃ না তুই এগিয়ে দে—

একটু থেমে সে হেসে উঠলো। বলেঃ তুই এগিয়ে দে আমাকে আমি ফের তোকে এগিয়ে দি। ফের তুই আমাকে এগিয়ে দিবি—ততক্ষণ ভোর হয়ে যাবে। তখন আমি একাই যেতে পারবো।

সকাল অব্দি তাই করি কেমন?

সোহাগী হাসতে থাকে।

মংলা বলেঃ তার চে, তুই যা। আমি দাঁড়িয়ে আছি—

ঃ না। তুই যা। আমি দাঁড়িয়ে আছি—

কে আগে যাবে—এই সমস্যার সমাধান হলো যখন, তখন রাত বড় বেশী নেই। সোহাগী বনের পথ দিয়ে চলে যেতে থাকে। যেতে যেতে আবার ফিরে তাকায়।

এক সময় তাকে আর দেখা যায় না।

মংলা গাছের ডালের বাধা ডিঙিয়ে মাছমারি গাঁয়ের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে।

পরের দিনই রোদ্দুর উঠলো। এমন রোদ্দুর কদিন মাছমারি গাঁয়ের লোকেরা দেখেনি।

মংলা একদিন চন্দর মিস্তিরিকে ডেকে এনে ডিঙিটাকে আপাতত সারিয়ে নিয়ে কর্‌করে পাঁচটা টাকা গুণে দিয়েছে।

চন্দর মিস্তিরি যাবার সময় বলে গেছে : এই গোঁজামিলে বেশিদিন চলবে না।

মংলাকে আবার একদিন তাহলে মহিষাজোড়ে যেতে হবে। গোকুল গায়েনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ডিঙিটা ভালোমতো সারিয়ে নিতে হবে কিংবা একটা নতুন ডিঙি দেবার কথা বলতে হবে।

সেই সঙ্গে সোহাগীর সাথে একবার দেখা করে আসবে সে।

কদিন তার সব কাজেই সোহাগী তাকে ঘিরে রয়েছে। একটি মুহূর্তের জন্যে সে ভুলতে পারে নি তাকে। আর পারে নি মৈনিমাসিকে।

মৈনিমাসি সেদিন বড়ো বেশি করে তার মনটাকে নাড়া দিয়ে ফেলেছে। এতদিন সে মৈনিমাসিকে ভুল চিনতো। আসল মৈনিমাসিকে সে এবার চিনতে পেরেছে।

মাছমারি গাঁয়ের সব জেলেই তার নকল রূপটাকেই চেনে। ভেতরে ভেতরে মৈনিমাসি একটা কান্নার সমুদ্র। সেখানে টান পড়লেই এক কান্নার জোয়ার ফুঁসে উঠবে।

সেদিন ঝড়ের রাতে সেই জোয়ার একবার ফুঁসে উঠেছিল।

উঠোনে রোদ্দুর ঢেউ ভাঙছে।

ময়না বউ সেই রোদ্দুরে উবু হয়ে বসে ধান শুকোচ্ছে।

উঠোনের খানিকটা জায়গা গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিয়েছে সে। তার ওপরে ধান ঢেলে মেলে মেলে দিচ্ছে ময়না বউ। উবু হয়ে বসে ঘুরে ঘুরে রোদ্দুরে ধান শুকোতে দিচ্ছে সে।

পিঠের কাপড় সরে গিয়েছে। নিটোল দুটি বাহু ঘুরছে ধানের ওপর। মাথার ওপর, পিঠের ওপর রোদ্দুর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। রোদ্দুরে স্নান করে একটা বলিষ্ঠ ঢেউ তালে তালে দুলছে যেন।

মংলা দাওয়ায় বসে সেই দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ ময়না বউর হাত দুটি অচল হলো। রৌদ্র-স্নাত ঢেউএর দোলা কি ভেবে অকস্মাৎ স্তম্ভিত হলো। কপাল ও ভুরুর ছায়ার নিচে দুটি চোখ কেঁপে উঠলো, যেন আলোয় ভেসে উঠলো।

ঃ সেদিন রাত্তিরে কুথায় থাকলি, কি খেলি—কিছুই তো বললি না। আর আমি এদিকে ভাতের হাঁড়ি লিয়ে সারারাত্তির বসে বসে ভাবছি। মাঝে মাঝে ঝড়ের আওয়াজ হচ্চে। আর আমি ভাবচি, তুই বুঝি এল্লি। দোর খুলে দেখচি, তুই এলি নি কি।

মংলা বলে ঃ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লি নি ক্যানে ?

ময়না বউর হাত দুটো আবার সচল হলো। ঢেউটা রোদ্দুরে আবার দুলে উঠলো।

ঃ কুনোদিন কুথাও থাকিস্ না। জল-ঝড়ে কুথায় গেল মনিষ্যিটা— ঘুম আসে চোখে ? তুই বল্‌বি নি ক্যানে ? তোর কি ? তুই কি কুনোদিন ভাবিস আমার কথা ?

ময়না বউ পেছন ফিরে বসে ধান শুকোতে থাকে।

মংলা লক্ষ্য করেছে, শেষের দিকের কথাগুলো বলতে ময়না বউর গলাটা যেন ছিঁড়ে গেল।

সেদিন সারারাত ময়না বউ খায় নি, ঘুমোয় নি। বাইরের ঝড়ের শব্দ হয়েছে আর সে ঘর-বার করে রাতটাকে ভোর করে দিয়েছে। ওর নিজের জন্য ময়না বউর দুঃখ ছিল না। চিন্তা ছিল না। চিন্তা শুধু সেদিন সেই দুর্যোগের রাতে মংলা কোন নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল কি না, ঠিকমতো দুটো খেতে পেয়েছিল কি না।

হ্যাঁ, সে তা পেয়েছিল।

নিরাপদ আশ্রয়ও পেয়েছিল, খেতেও পেয়েছিল।

কিন্তু পরের দিন ময়না বউকে সে তো জিজ্ঞেস করে নি, ময়না বউ রাতে খেয়েছিল কি না, ঠিকমতো ঘুমিয়েছিল কি না। সে তো সেদিন ময়না বউর চোখে-মুখে উপোস আর রাত-জাগার চিহ্ন লক্ষ্য করেছিল। তবু কেন সে ওকথা জিজ্ঞেস করলো না ?

সে তো জিজ্ঞেস করলেই পারতো ঃ কাল রাত্তিরে তুই আমার কথা ভাবছিলি বউ ?

মংলার নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে নিঃশব্দে কোথা থেকে রাঘব উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

ময়না বউ জানতে পারে নি রাঘবের উপস্থিতি।

ময়না বউ মুখ ফিরিয়েই বলে।

ঃ কুনোদিন তুই আমার মনটাকে দেখলি নি।

হাতের ধান ঝেড়ে সে দুহাতে খাটো কাপড়টা টেনে মুখের ঘাম মুছে নেয়।

লাঠিটাকে ঠেস্ দিয়ে রাঘব দাওয়ায় উঠতে যাচ্ছিল, ময়না বউর কথাটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো। পেছন ফিরে সে ময়না বউর দিকে একবার আর একবার মংলার দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর কথাটার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করে কপালে অনেকগুলো ভাঁজ নিয়ে সে দাওয়ায় উঠে বসলো।

মংলা কি করবে, ভেবে না পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। আড়চোখে রাঘবের দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। তারপর উঠোনে নেমে পড়ে সে।

ময়না বউ উঠে দাঁড়ালো।

ঃ কুথায় যাচ্চিস তুই ?

পিছন ফিরতেই ময়না বউ রাঘবকে দেখতে পায়। পিঠের ওপর কাপড়টাকে মেলে দিয়ে পায়ের তলার ধান ঝেড়ে ধানের বৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

রাঘব ময়না বউর ভিজে দুটি চোখের পাতা দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ময়না বউ মংলাকে বলে ঃ কুথাও যাবি নি তুই। দাওয়ায় বসে থাকবি। দেখবি, মুরগীগুলো একটাও ধান খায় না যেন।

ময়না বউ ঘরের ভেতর চলে গেলে মংলা রাঘবের দিকে একবার তাকায়। তারপর উঠোনের ওপর সংকুচিত ছায়া এঁকে রাস্তার দিকে হেঁটে চলে যায়।

অনেকদিন পরে ভেতরের উঠোনে জ্যোৎস্না ফেটে পড়েছে। আশ্চর্য ধার আছে এই জ্যোৎস্নায়।

উঠোনের সেই বিরাট একখানা চৌকো জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে ময়না বউ অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলো।

দূরে সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে।

চরের বালির ওপর এক অসহ্য যন্ত্রণায় সে বুক ভাঙছে। এক জান্তব আর্তনাদের মতো তার আওয়াজটা জ্যোৎস্নায় এসে মিশছে।

ময়না বউ পারে না জ্যোৎস্নার এই তুমুল কোলাহলকে সহ্য করতে।

দুহাতে বুক চেপে মুখ থুব্‌ড়ে সে বিছানায় পড়ে রইলো। অসহ্য গরম লাগছে তার। সারা গা-টা যেন তার পুড়ে যাচ্ছে আজ। নিশ্বাসে আগুন। কানের গোড়া পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে তার।

না। সে সমুদ্রের এই বুকফাটা একটানা গোঙানি আর শুনতে পারে না। দুকানে আঙুল দিয়ে পড়ে রইলো সে।

কিন্তু একী! আরো প্রবলতরো একটা গোঙানি সে কোথা থেকে শুনছে?

এ যে আরো আকুল-করা! আরো ব্যাকুলতরো! এ নিশ্চয়ই তার বুকের ভেতর থেকে।

তার বুকের ভেতরে একটা উত্তাল সমুদ্র যেন প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভে বারে বারে ফুঁসে উঠছে। আর সেই গোঙানির মতো একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন একটা পেঁচালো সরীসৃপের মতো পিচ্ছিল সেই যন্ত্রণাটা তার শিরায় শিরায়

হাঁটছে, তার প্রতিটি রক্ত কণিকাকে বিষিয়ে দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে পিষে মেরে ফেলবার জন্যে ছুটে আসছে।

ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরটা তার কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে। এখন যদি তার একটা হাত কিংবা পা কেউ কেটে নিয়ে যায়, তবুও সে টেরই পাবে না। আর এখন যদি সে মরেও যায়, সে জানতে পারবে না।

দু কানের ভেতর দিয়ে একটা একটানা হূহূ শব্দ বয়ে চলেছে! নাকি ও একটা ঝড়। সেদিন রাতের ঝড়ের মতোই আর একটা ঝড়।

সেদিন থেকে মংলা যেন কেমন হয়ে গেছে। মহিষাজোড় থেকে ফিরে এসে সে ময়না বউকে কিছু বলে নি, কিছু জিজ্ঞেসও করে নি।

তারপর তো অনেকগুলো দিন কেটে গেছে।

মংলা তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না, তার কাছেও আসে না। সব সময় দূরে থাকে সে।

খাবার সময় খেতে আসে শুধু। তাও আগেকার মতো তার খাওয়া নেই। পাখির মতো ঠুক্‌রে দু গাল ভাত খেয়ে একঘটি জল ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে যায়। পাতের ভাত পাতেই পড়ে থাকে। একই ঘরে বাস করে, কিন্তু কত দূরে।

অথচ সে যে সারাক্ষণ তার কথাই ভাবে।

হ্যাঁ, ময়না বউ বুলানের কথা ভাবতে গেলেই মংলার মুখ ভেসে ওঠে।

এই বারো বছর সে বুলানের নামে মংলার মুখটাকেই মনে করেছে। মংলার দেহটাকে, মংলার ভালোবাসাকে সে গভীরভাবে কামনা করেছে।

মংলা তা জানে না। মংলাকে সে জানতেও দেয় নি।

সে নিজেও জানতো না। কিন্তু ইদানীং তার মন তার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে বুঝতে পারছে, মংলাকে না হলে সে বাঁচবে না। বুলান যদি ফিরেও আসে, তবু তার মংলাকে চাই। মংলার জন্যে তার মনটা আজকাল বড়ো উতলা হয়ে উঠেছে।

যতদিন মংলা কাছাকাছি তাকে ঘিরে ছিল, ততদিন সে এমন হয় নি। কিছুদিন হলো মংলা যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যতই সে দূরে সরে যাচ্ছে, ততই তাকে পাবার জন্যে সে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

আষাঢ় শেষ হতে আর বেশি দিন বাকি নেই।

কটা দিন ফুরোলে বারো বছর শেষ হবে। তার প্রতীক্ষাও শেষ হবে।

কিন্তু কেন এই প্রতীক্ষা?

তিনমাস মাত্র বুলানকে সে পেয়েছিল। বুলানের স্মৃতি মাত্র তিন মাসের। তিন মাসের বুলানের জন্যে সে বারো বছর প্রতীক্ষা করেছে। তার জীবনের জোয়ারের বেলা শুধু প্রতীক্ষাতেই কেটে গেল। দুদিন পরে তার শরীরে ভাঁটার টান ধরবে। গায়ের চামড়াগুলো কুঁচকিয়ে আসবে, ভাঁজ পড়বে কপালে, মুখে, সারাদেহে। বুড়ো হয়ে যাবে সে পদ্মবুড়ির মতো। তাহলে বুলানের অস্পষ্ট ক'টা দিনের স্মৃতি নিয়ে সে কি পেল? যে ফিরবেনা, কেন সে তার জন্যে অকারণ পথ চেয়ে বসে থাকবে?

বারো বছর সে তো পথ চেয়ে বসে থাকলো।

বারো বছরে কতোবার মংলা তার কাছে এসেছে, তাকে দু বাহুর মধ্যে পেতে চেয়েছে। কিন্তু সে বুলানের স্মৃতির জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে তাকে কঠিন আঘাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। মংলাকে নিবিড় নিকটে সে আসতে দেয় নি।

এবার বারো বছর কেটে যাবে।

তার প্রতীক্ষার ব্রতও শেষ হবে। সে এবার নতুন কাপড়, নতুন

শাঁখা, আর নতুন সিঁদুর প্পরে মংলার চওড়া বুকটার ওপর একটা ঢেউএর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। বলবে: আমাকে এবার তুই পিষে মেরে ফ্যাল্। কাল সকালে যেন আমি আর বেঁচে না উঠি।

আজকাল আকাশে মেঘ জম্‌লে, একটু জোরে বাতাস বইলে, তার বুকের ভেতরটা সমুদ্দুরের মতো গুম্‌রে ওঠে। সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙার শব্দেও তার বুকটা তোলপাড় করে ফেটে পড়তে চায়।

আর এই জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্নার এই তুমুল কোলাহল!

সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে॥

পলাশ বনের গন্‌গনে আগুনে তার প্রতিটি লোমকূপ যেন পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে।

আর সে পারে না।

বিছানাটাও আগুন হয়ে গেছে। আহত একটা পাখির মতো সে বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তারপর কি ভেবে উঠে পড়লো, গায়ে কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

দরজায় হাত দিল। খিল্‌টা আস্তে খুললো। বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে নিয়ে পা টিপে উঠোন পেরিয়ে চলে যায়। বাইরের উঠোনে তখন একটা জ্যোৎস্নার সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। জ্যোৎস্নার জোয়ার এসেছে আজ।

দুধের মত সাদা হয়েছে রাস্তাটার রং। মাঝে মাঝে ছায়ার বৃত্ত। ময়না বউ একবার ছায়ায় ডুবে যায়, আবার একটু পরেই আলোয় ভেসে ওঠে। আলো আর ছায়ার ভেতর দিয়ে একটা রহস্যময় ডিঙি যেন দক্ষিণ দিকে তরতর করে ভেসে যায়। বুকের কাপড় কিছুতেই থাকছে না, বার বার খুলে খুলে পড়ছে।

বালিয়াড়ির মাথায় রহস্য ঘনীভূত হলো।

পেছন ফিরে তাকালো সে।

না, কেউ কোথাও নেই।

সামনে জ্যোৎস্নার আলোয় পুলকিত সমুদ্র, আর পেছনে নিস্তব্ধ মাছমারি গ্রাম ঘুমে অচেতন। ময়না বউ দৌড়ে বালিয়াড়ির ওপারে নেমে যায়।

একটু দূরে ডিঙিগুলো বালির ওপর আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে।

ময়না বউ ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়ায়। চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়। হঠাৎ কি ভেবে টান মেরে গায়ের কাপড়টা খুলে ফেলে একটা ডিঙির ওপর রেখে সম্পূর্ণ নগ্ন অনাবৃত দেহে সমুদ্রের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে যায়। আকাশের জ্যোৎস্না তার সমস্ত লজ্জা ঢেকে দিল।

সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়ালো সে।

সমুদ্রের নীল জল বারে বারে দুধের বন্যায় ভেঙে পড়ছে। ফেনার হাসিতে তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন খিল খিল করে হেসে উঠলো।

সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তার নিজের দেহে রাখলো। তার এই দেহে বারো বছরের তৃষ্ণা জমাট হয়ে রয়েছে।

আজ হবে সেই তৃষ্ণার শান্তি!

দেহের শিরায় শিরায় যে আগুন এতদিন হেঁটেছে, আজ তা নিভে গিয়ে শীতল হবে।

পায়ের তলায় বালি ভিজে উঠলো।

সে আবার নিজের দিকে তাকালো। সে যে এত সুন্দর, তা সে এতদিনে জানতে পারলো।

মংলা তাকে বলেছে বটে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে নি। ভেবেছে, মংলার চোখের নেশায় সবই সুন্দর। কিন্তু আজ সে বুঝতে পারলো, মংলা মিথ্যে কথা বলে নি। এই জন্যই বোধ হয় মংলা তার দিকে চেয়ে বাটি বাটি হাঁড়িয়া খেয়েছে।

সে যে সত্যি সুন্দর, তা সে এতদিনে জানতে পারলো।

একটু ভয় পেল সে।

তারপর কয়েক পা গিয়ে সমুদ্রের জলে সে তার শরীরটাকে ডুবিয়ে দিল। না, আর কোন ভয় নেই, কোন লজ্জা নেই। সমুদ্র তার সব ভয়, সব লজ্জা মুছে নিয়েছে।

এখন সে ময়না বউ নয়, মাছমারির গাঁয়ের বউ নয়। এ পৃথিবীর কেউ নয়। এখন সে শুধু একটি সৌন্দর্যের প্রতিমা!

ঢেউ এগিয়ে এলো।

ঢেউএর সামনে সে তার বুকটাকে পেতে ধরলো। ঢেউটা চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে যায়। সমস্ত শরীর তার খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আবার একটা ঢেউ আসে।

তারপর একটা।

তারপর আর একটা।

ময়না বউকে কি যেন একটা নেশায় পেয়েছে।

শরীরের জ্বালাটা ধীরে ধীরে নিভে আসে। বিষাক্ত যে যন্ত্রণাটা এতক্ষণ তার শিরায় শিরায় হাঁটছিল, তাও শীতল হয়ে ধীরে ধীরে মরে যায়। এবার শরীরটা তার বেশ হাল্‌কা মনে হয়।

আবার সে ঢেউএর সামনে নিজেকে পেতে দেয়।

এবার বুকের ভেতর থেকে একটা শিরশির কাঁপুনি ওপরের দিকে উঠতে থাকে। আর ছড়িয়ে পড়ে শরীরের আনাচে কানাচে। সকল রোমকূপ এবার শীতল হয়েছে।

শীতে সমস্ত শরীর তার কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এই জন্যেই বোধ হয় মংলা তাকে একদিন সমুদ্রে এক সঙ্গে স্নান করতে ডেকেছিল। দেহের উত্তাপ শীতল করতেই সে সেদিন তাকে ডেকেছিল: যাবি বউ আমার সাথে সমুদ্দুরে নাইতে?

না। মংলার কথায় সেদিন সে রাজি হয় নি। কেন রাজি হলো না? কেন এক সঙ্গে সমুদ্রে গা ডুবিয়ে বুকের উত্তাপকে নিভিয়ে

নেয় নি? তাহলে তাকে এতদিন এই অসহ্য আগুনে জ্বলতে হতো না।

উঠে এসে বালির ওপর দাঁড়ালো ময়না বউ। সমস্ত শরীর বেয়ে জল আর চাঁদের আলো ঝরছে।

আবার সে নিজের দিকে ফিরে তাকালো।

কিন্তু এ কী করেছে সে? শরীরে একটুও আবরণ নেই তার। এতক্ষণ তার হুঁস ছিল না।

কি এক দুর্জয় শক্তি তাকে যেন এখানে টেনে এনেছে, সমুদ্রের ঢেউতে ডুবিয়েছে, সে জানে না। এতক্ষণ তার যেন নিজের ওপরে কোন কর্তৃত্ব ছিল না। একটা মোহ, একটা একটা নিঃসঙ্গ বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে বেহুঁস করে এখানে টেনে এনেছিল।

না, আর কিছুই তার মনে পড়ে না।

শুধু একটা যন্ত্রণা রি রি করে বুকের মাঝখানটাতে জ্বলছিল। এখন সেখানে শান্তি।

সেই যন্ত্রণাই তার নিয়তি! সেই তাকে পাকে পাকে বেঁধে এখানে টেনে এনেছে, সম্পূর্ণ অনাবৃত করে সমুদ্রের জলে ডুবিয়েছে।

এখন একটু যেন ভয়-ভয় করছে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, তার ভীষণ লজ্জা করছে। কী করেছে সে! কোনদিন সে এমন করে না। আজ কেন সে এমন করলো? তবু রক্ষে, এখন নিশুতি রাত। কেউ নেই সমুদ্রের চরে।

কেউ এ অবস্থায় তাকে দেখে ফেললে সে হয়তো জন্মের মতো সমুদ্রের নিচে নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়ে তবে বাঁচতো।

এখন তাড়াতাড়ি সে ডিঙিটার কাছে হেঁটে যাবে। কাপড়টা নিয়ে গায়ে জড়াবে। তারপর তরতর করে সে চাঁদের আলো আর টুকরো টুকরো গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কেউ জানবে না, আজ রাতে তাকে কী আশ্চর্য পাগলামিতে

পেয়েছিল। বালির ওপর পায়ের দাগ এঁকে সে ডিঙিটার দিকে ফিরে চলে।

পায়ের তলায় তার অনাবৃত দেহের ছায়াটা পড়েছে। সে তাকে দু পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ডিঙিটার পাশে এসে দাঁড়ায়।

হাত বাড়িয়ে কাপড়টা তুলে নিতে নিতে সে চমকে ওঠে।

ডিঙির ওপাশে যেখানে ছায়াটা ভয়ের মতো জমে আছে, সেখান থেকে কে যেন তার কাপড়ের একদিকটা টেনে রেখেছে।

ভয়ে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

কাপড়টা আর টানতে সে যেন তার সব শক্তি হারিয়ে ফেলে। জোরে হেঁচকা টান মারতেই একটা মানুষের শরীর চাঁদের আলোয় সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

ঃ কে ?

বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল ময়না বউ। কিন্তু আওয়াজটা গলার কাছে এসে আছ্ড়ে পড়ে শিথিল হয়ে গেল।

ঃ ভয় পাস্ নি। আমি—ময়না বউ।

ঃ কে ? কে তুই ? বুলান ? তুই বুলান ? ক্যানে ? ক্যানে তুই এয়েচিস ? ফিরে যা, ফিরে যা তুই। আমি আর তোর জন্যে ভাবি না। এদ্দিন আসিস্‌নি তুই, আজ এলি ক্যানে ? ফিরে যা, ফিরে যা তুই। কাপড় ছাড়—

কাপড়ের আধখানা কোন মতে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে ময়না বউ। কাপড়টা তার ছেড়ে দেবার জন্যে সে মিনতি জানালো, কিন্তু ছাড়াতে পারলো না। ডিঙিটার ওপাশ থেকে শোনা গেল : আমি—আমি বউ, আমি মংলা।

ঃ মংলা ? তুই এখানে ক্যানে ? তুই এখানে কিসের জন্যে এয়েচিস্ ?

ঃ তোর জন্যে। তুই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলি, আমার ভয় হলো। তুই কি করিস্—দেখবার জন্যে আমিও পিছন পিছন চলে এলাম।

মংলা তাহলে তাকে এতক্ষণ দেখেছে। তার নিরাবৃত দেহটাকে সে তাহলে এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

তার এখন লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ঃ ছাড়, ছাড়। আর দেরি করিস্ নি। ছেড়ে দে। আবার কেউ এসে পড়বে এখানে।

মংলা কাপড় ছাড়ে না।

ঃ বউ—

ঃ কি ?

ঃ বউ—

ঃ কি, বল্ না।

ঃ কাছে শুন।

ঃ না। এখনো বারো বছর হয় নি।

চরের বালির ওপর সমুদ্র একটা দীর্ঘশ্বাস রাখলো

মংলার হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে গেল। কাপড়টাকে ময়না বউ ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল।

ঃ আর ক'টা দিন তো বাকি। একটু সামলে থাক। আমি তো তোরই হবো। সবই তুই পাবি।

ময়না বউ চলে যায়।

মংলার সামনে সমুদ্রের বিস্তার্ণ একখানা চর নির্নিমেষ পড়ে থাকে।

বুধিয়ার যে কি হয়েছে, কে জানে। সে আর সমুদ্রে যাবে না।

সমুদ্র তাকে কোনদিন টানে না।

তবু সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে প্রতিদিন ভোরে সমুদ্রে গেছে। মনে অসীম ক্লান্তি নিয়ে দুপুরে ফিরে এসেছে। সে তার মন বুঝতে দেয় নি কাউকে। আর দিনের পর দিন ক্লান্তির পাহাড় জমিয়ে তুলেছে মনে মনে।

আজ সে কিছুতেই সমুদ্রে যাবে না।

না, সে কিছুতেই সমুদ্রে যাবে না।

মাছমারির জেলেদের সেই বেপরোয়া জীবন তার একেবারে ভালো লাগে না।

তার চেয়ে গল্প বলো, গান করো—বুধিয়া বসে শুনবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে শুনবে।

পদ্মবুড়ির মুখে সে একই গল্প কতোবার শুনেছে, কিন্তু কোনবারই পুরোনো হয় না। একই গান তার খনখনে গলায় কতোবারই সে শুনলো, তবু সে সেইগান আরো শুনতে চায়।

পদ্মবুড়িকে অনেকদিন দেখে নি বুধিয়া। অনেকদিন তার মুখের গল্প, তার গলার গান সে শোনে নি।

এখন বৃষ্টির দিন। তাই যাত্রা গানের বাজারও বড়ো মন্দা।

বুধিয়া বহুদিন যাত্রা গানও শোনে নি।

দশ বছর বয়েস থেকে সে সমুদ্রে যেতে সুরু করেছে।

সেই যে বছর বুলান সমুদ্রে গেল, আর ফিরলো না। আর রাঘব পা কেটে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো, সেই বছর থেকেই বুধিয়ার সমুদ্র যাত্রা সুরু হয়েছে।

দশ বছর বয়েসের পাতলা চেহারার একটি বালক মংলাকে সাহায্য করবার জন্যে ভোর রাতে ডিঙিতে চলে যেত।

চোখের পাতায় হয়তো তার তখনো ঘুম জড়িয়ে আছে। পা দুটো হয়তো ঠিকমতো মাটিতে পড়ছে না। তবু সে জালের বাঁশটাকে কাঁধে চাপিয়ে মংলার পেছনে পেছনে চরের ওপরে ডিঙিটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিঙিটাকে ঠেলে নিয়ে সমুদ্রে চলে গেছে।

দশ বছর বয়েসেই সে বুঝতে পেরেছিল, বুলান কোথায় চলে গেছে আর রাঘব পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

তার রুগ্ন গায়ে যেটুকু জোর আছে, তাই দিয়ে সে এতদিন মংলাকে সাহায্য করে এসেছে।

কিন্তু সে আর পারছে না।

সমুদ্রকে সে কোনদিন ভালোবাসতে পারে নি, সমুদ্রের সঙ্গে তার কোনদিন মিতালি হয় নি।

আর মাছমারি গাঁয়ের জীবনধারাকে সে কোনদিন মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি।

না। সে আজ কিছুতেই সমুদ্রে যাবে না।

মংলা তাকে ডাকলো। ময়না বউ তাকে কতো সাধলো। সে বিছানা ছেড়ে উঠলো না।

সব শেষে রাঘবের গলা গর্জে উঠলো।

বুধিয়া উঠে বসলো।

: আমি আজ ডিঙিতে যাবো নি।

: যাবি নি ?

রাঘব রাগে ফেটে পড়ে যেন।

: না। আমার ভালো লাগে না।

: ভালো লাগে না তো করবি কি ?

: বলেচি তো—

রাঘবের চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

হয়তো এবার সে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে।

কিন্তু সে তা করে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে জালের বাঁশটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে বলে : চল্ মংলা, আমি যাবো।

মংলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে : তুই যাবি ?

: হুঁ। চল্—

রাঘব বুধিয়ার দিকে তাকায়। তার দুচোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেন।

তারপর সে জাল কাঁধে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মংলার পেছনে পেছনে বালিয়াড়ির দিকে চলতে থাকে।

বারো বছর পরে রাঘব আজ সমুদ্রে গেল।

চর থেকে ফিরে এসে ময়না বউ বলেঃ বুড়ো মনিষ্যিটা খোঁড়া পা নিয়ে ডিঙিতে গেল, আর তুই একটা মরোদ হয়ে কিনা ঘরে বসে রইলি? এঁ্যা—

বুধিয়া করুণ দুচোখে ময়না বউর দিকে চেয়ে থাকে।

ঃ আমার একদম ভালো লাগে না—

ঃ তাহলে বউকে খাওয়াবি, পরাবি কি করে?

ঃ বউ হবে নি—

ঃ বারে, আমি রয়েচি তো। আমাকে তো খাওয়াতে, পরাতে হবে তো—

ঃ ও কথা তোকে ভাবতে হবে নি।

সারা সকাল বুধিয়া গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো। মাছমারি গাঁয়ের পাখিদের ডাক কান পেতে শুনলো। এমনভাবে কোনদিন সে মাছমারি গাঁয়ের কোন সকালকে পায় নি।

পলাশ বনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে বারে বারে ভাবতে থাকে, আজ যদি সে একবার সেই গন্ধবেবা আর গন্ধববুনির দেখা পায়, তাহলে তাদের কেমন দেখতে, সে একবার দেখে নেবে।

গন্ধববুনিটাকে কি মৈনিমাসির বোন-ঝির মত দেখতে? না কি অন্য কোন রকম? গায়ে ওদের কোন্ ফুলের গন্ধ?

বুধিয়া চেয়ে দেখলো, পলাশবনের ফুল কবে ঝরে গেছে।

গন্ধবেবা আর গন্ধববুনিটাও বোধহয় তাদের ঘরে ফিরে গেছে। আর বোধহয়, তারা মাছমারি গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে না।

সে যদি তাদের দেখা না পায়, না-ই পেল। এখন যদি সে পদ্মবুড়ির একবার দেখা পায়, তাহলে বেশ হয়। পদ্মবুড়ির মুখ থেকে দুটো গল্প কিংবা দুটো গান শুনে নিত সে।

মাছমারি গাঁয়ের পথে পদ্মবুড়িকে সে কোথাও দেখতে পেল না।

দুপুরে রাঘব ঘরে ফিরলো।

বুধিয়াকে সে কিছুই বললো না। অথচ রাঘবের চোখে-মুখে ছিল একটা আসন্ন ঝড়ের আভাস।

খাওয়ার পর বুধিয়া দাওয়ায় মাদুর পেতে তাতে কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল।

চোখে তার একটুও ঝিম্ এলো না। তার মতো জোয়ান ছেলে ঘরে থাকতে আজ তার বুড়ো বাপ খোঁড়া পা নিয়ে সমুদ্রে গেল, আর সে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় সারা সকাল বিনা কাজে ঘুরে বেড়ালো।

নিজেকে কেমন যেন তার বড়ো অপরাধী মনে হয়।

কিন্তু সমুদ্রে যেতে যে তার ইচ্ছে করে না।

সে ভাবে, সে কেন জেলেদের ঘরে জন্মালো ?

জন্মালো যদি, জেলেদের জীবনকে কেন সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারলো না ? জেলের ঘরে জন্মেছে যখন, তাকে তো সমুদ্রে যেতে হবে। সমুদ্র-জীবনের সকল দুঃখ তাকে মেনে নিতে হবে।

তার মন চায় দিনরাত বাঁশির সুরে ডুবে থাকতে। তার একটি মাত্র সাধ সে যাত্রার দলে চাকরি করবে, বাঁশি বাজাবে। যাত্রার দলের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবে। আর বুঝি তার সে সাধ পূর্ণ হবে না।

রাঘব আজ রাগ করে সমুদ্রে গেছে। না, কাল বুধিয়া তাকে সমুদ্রে যেতে দেবে না।

কাল বুধিয়া মংলার সঙ্গে ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে যাবে।

রোদ্দুরে বিকেলের রং লাগতেই সে বাঁশিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। পলাশবনের পাশ দিয়ে বালিয়াড়ির দিকে সে হেঁটে চলে যায়।

বালিয়াড়ির পশ্চিম দিকের কোলে যেখানে বসে সে রোজ বিকেলে বাঁশি বাজায়, সেখানে দূর দিগন্ত-রেখার দিকে চেয়ে সে একটু দাঁড়িয়ে থাকে।

বেলাভূমির পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর বিরাট একখানা আকাশ। প্রথমে ধূসর, তারপর নীল, তারপর মন-কেমন-করা রক্তিমা!

সূর্য তখনো সমুদ্রের জলে নামে নি।

আকাশের গোধূলি তখনো রঙীন হয়ে ওঠে নি। অথচ পশ্চিম আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে একখানি অবারিত প্রসন্নতা।

সারাদিন তার মনে যে গ্লানি জমাট হয়ে ছিল, তা যেন ধীরে ধীরে কেটে গেল। মনটা তার হালকা হয়ে গোধূলির রঙে হঠাৎ মেতে উঠলো।

বাঁশিতে ফুঁ দিল সে।

বেলাভূমি আর সমুদ্রকে ছুঁয়ে তার বাঁশির সুর যেন আকাশ স্পর্শ করলো।

বালির ওপর গা ঢেলে দিয়ে সে বসে পড়ে।

তারপর বাঁশিতে সুর তোলে। যত রকমের গান জানে সে, যত রকমের সুর—সে নিজের মনে বাজিয়ে চলে।

কিন্তু কেন-ই বা সে রোজ এমনি সময়ে এখানে এসে বাঁশি বাজায়? কাকে শোনাতে চায় সে তার বাঁশির সুর? আর কে-ই বা শোনে? সে তা জানে না।

শুধু সে জানে, বাঁশি বাজাতে তার ভালো লাগে। তার যা কিছু মনের সাধ, সে এই বাঁশির সুরে বাজিয়ে যায়। কেউ শুনুক বা না শুনুক, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

এই আকাশ, এই সমুদ্র, সমুদ্রের এই বেলাভূমি তো তার বাঁশি শোনে। আর সমুদ্র ও আকাশের এই রঙীন প্রসন্নতায় সে যদি বাঁশি বাজাতে না পারে তবে যে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

জীবনে তার একমাত্র কাজ বাঁশি বাজানো।

সূর্য সমুদ্রের জলে নামবার আগেই এক ফালি মেঘ যেন আঁচল দিয়ে ওকে ঢেকে নিল।

মেঘের ফালি মুহূর্তের মধ্যেই সোনা হয়ে উঠলো।

কয়েকটা পাখি তার ওপর দিয়ে উড়ে ডাঙার দিকে ফিরে এলো। তীরের গাছগুলো একটা বিষণ্ণ ছবির মতো ফুটে উঠলো।

বুধিয়ার বাঁশির সুর সেই ছবির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

বাঁশি বাজাত বসে পদ্মবুড়ির একটা গল্প বুধিয়ার মনে পড়ে।

এক ছিল চাষার ছেলে। সে বাজাতো বাঁশি। সাপ্‌লা দীঘির ধারে বসে সে রোজ সন্ধেয় নিজের মনে তার বাঁশি বাজাতো। রাজার মেয়ে শুনলো তার বাঁশির সুর। রাজার মেয়ের মনটা কেমন হয়ে যায় সেই বাঁশি শুনে। ওর বাঁশিতে যেন কোন যাদু লুকিয়ে আছে। সে একদিন সাপ্‌লা দিঘির ধারে এসে চাষার ছেলেকে বলে ঃ কেন তুমি বাঁশি বাজাও ? তোমার বাঁশির সুরে আমার যে সব ভুল হয়ে যায়। তুমি আর তোমার বাঁশি বাজিও না।

চাষার ছেলে করুণ মুখে বলে ঃ বেশ, বাজাবো না।

তারপর দিন থেকে আর বাঁশি বাজে না। রাজার মেয়ের মন আরো খারাপ হয়ে যায়। কি যেন নেই। কি যেন হারিয়ে গেছে তার।

পরের দিন রাজার মেয়ে সাপ্‌লা দীঘির ধারে এসে বলে ঃ তুমি আর বাঁশি বাজাও না। তাই আমার সন্ধে যে কাটতে চায় না। আমার কথা রাখো। কাল থেকে তুমি তোমার বাঁশি বাজিও। তোমার বাঁশি শুনতে না পেলে আমি মরে যাবো।

চাষার ছেলে বাজায় বাঁশি। আর রাজার মেয়ে শোনে।

বুধিয়া জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তারপর ?

পদ্মবুড়ি হেসে বলেছিল ঃ তারপরের কথা আর একদিন শুনিস—

পদ্মবুড়ির ওই এক দোষ। কোন গল্প সে শেষ করে না। কেন সে গল্প শেষ করে না ? গল্পের শেষ কি সে জানে না ?

পদ্মবুড়ির ওপর বুধিয়ার ভারি রাগ হয়। বুধিয়া চেয়ে দেখলো, মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবছে। সমুদ্রের জলে রঙের বন্যা। আকাশ আর বেলাভূমি তখন রঙের নেশায় কাঁপছে।

বুধিয়া বাঁশিতে নতুন সুর ধরে। বিদায়ের সুর, বিষাদের সুর—

আজ সকাল থেকে রাঘবের বুকের ভেতর একটা জ্বালা ধরেছিল। এই জ্বালাটা যে একেবারে নতুন, তা নয়। জ্বালাটা অনেক দিনের।

বুলানকে যে দিন সমুদ্র গিলে খেয়েছে, যেদিন থেকে খোঁড়া পা নিয়ে সে মাছমারির চরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে দিন থেকেই তার বুকের ঠিক মাঝখানটাতে একটা জ্বালা ধিকি ধিকি করে জ্বলে আর ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে হঠাৎ এক সময় তার গলাটাকে হাড়িকাঠের মতো চেপে ধরে।

তখন কেমন যেন দম নিতে কষ্ট হয় তার।

আজ আবার সেই জ্বালাটা বুকের ভেতর থেকে গলার দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে।

তার মনে হয়, সে বড়ো একা। এই পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কেউ নেই। যখন গায়ে তার যৌবনের ভরা তেজ ছিল, তখন সে এক একদিন বুলানের মাকে কিছু না বলেই ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে চলে যেত। তখনও বুলান হয়নি। রাঘব মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে ডিঙি থামিয়ে একবার চারদিকে তাকাতো ভাল করে।

কেউ নেই, কিছু নেই; শুধু জল আর জল।

জলের সেই অসীম বিস্তারের মধ্যে কেউ নেই। শুধু সে একা।

বুকের ভেতরে, আজ যেখানে জ্বালাটা জেগে আছে, সেখানে কেমন যেন একটা সুড়সুড়ি লাগতো।

ভয়। রাঘব নিজেই হেসে উঠতো। ভয়? কাকে ভয়? কেন ভয়? সে না মরোদ? গায়ে জোর নেই তার?

ইচ্ছে করেই দেরি করে সে ডাঙায় ফিরতো।

আজ সেখানে জ্বালা।

রাঘবের বুকে একটা পুরানো জ্বালা পুড়ছে।

এখন ঘরে বাইরে যেদিকে সে তাকায়, আপনার বলতে কাউকে সে খুঁজে পায় না। সে একা, বড়ো একা। মাঝ-দরিয়ায় তার প্রথম যৌবনের নির্জন অভিজ্ঞতার মতো সে একা।

ভয়? না, ভয় পায় না সে। কিন্তু জ্বালা ধরে। বুকের মাঝখানটায় পোড়ে।

মংলা তার কথা শোনে না, ময়না বউও তার কথা শোনে না। যা নিয়ে ঘনাই মোড়লের সঙ্গে তার মন-কষাকষি আর মাছমারি গাঁয়ের সঙ্গে তার মুখ-দেখাদেখি বন্ধ, তাকেই ওরা দুজনে আস্কারা দিয়ে মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সে ভেবেছিল, তার মোড়লি গেছে কিন্তু সে মাছমারি গাঁয়ে মাথা উঁচু করে থাকবে। মংলা আর ময়না বউ দুজনে তার মাথাটা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

নইলে ঘনাই মোড়ল তারই দাওয়ায় বসে কিনা তাকে অপমান করে যায়।

ময়না বউ যে এমন বদলে যাবে, সে কোন দিন ভাবতে পারে নি।

বুলান যেন এ পৃথিবীর কারো কেউ ছিল না। যেন শুধু তারই ছেলে। সকলের মন থেকে বুলান মুছে গেছে। আর সে-ই শুধু তার স্মৃতি বুকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছে।

সেদিনের বুধিয়াও তার কথা শোনে না।

সেও জয়ধ্বনি দেয় গঙ্গার, সমুদ্দুরে যেতে চায় না, তার নিষেধ না শুনে বাঁশি বাজায়।

অথচ রাঘব চায়, তার কথা মতো তারা সবাই চলুক।

শত্রুর সঙ্গে কোন রকম আপোষ রফা করতে সে জানে না। সে জানে শুধু লড়াই করতে, সমস্ত শক্তি নিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

সমুদ্র তার শত্রু আর শত্রু এই মাছমারি গাঁ।

কিন্তু সমুদ্র তার আধখানা পা খেয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

আর এদিকে বুড়ো বয়েস তা শরীর থেকে গতর নিঙড়ে বের করে নিয়েছে।

সে কি নিয়ে লড়াই করবে ?

তবু মংলা, ময়না বউ, বুধিয়া যদি তাকে সাহায্য করতো, তাহলে সে কিছুই ভাবতো না। শত্রুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কলজেটা উপড়ে আনতো।

আজ তার সম্ভাবনা নেই।

এই বিশাল পৃথিবীতে সে বড়ো একা, বড়ো অক্ষম।

তার অক্ষমতার কথা একটা শেয়ালেও জানতে পেরেছে। সেদিন তার চোখের সামনে দিয়ে একটা শেয়াল জ্যান্ত একটা মুরগী অনায়াসে নিয়ে পালালো। সে চেয়ে দেখলো, কিন্তু কিছুই করতে পারলো না।

রাঘবের বুকের ভেতরে জ্বালাটা মোচড় খায়।

সে আর দেরি না করে উঠে পড়লো। মাদুর আর বালিশটা তুলে রেখে দিয়ে মাটির উপর লাঠির গুঁতো মারতে মারতে উঠোন পেরিয়ে চলে যায়। সারা পৃথিবীটাই আজ তার শত্তুর !

কানাই ঢিবির পাশ দিয়ে রাস্তার ধারে উবুড় হয়ে পড়ে-থাকা কংকালসার ডিঙিটার ধার ঘেঁসে, নারকেল গাছের ছায়াটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে সে পলাশ বনের ভেতর ঢুকে পড়ে।

সে কাউকে ক্ষমা করবে না। শত্রুর সঙ্গে আপোষ-রফা কোন দিনই সে করতে পারবে না।

সারা পলাশ বনে সে তোলপাড় করে খুঁজলো। একপায়ে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুহাতে মাটিতে লাঠির গুঁতো মেরে সে পলাশ বনের বহু যুগের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

কাউকে খুঁজে পেল না সে।

আজ সামনে পড়লে কাউকে সে আস্ত রাখতো না। আজ কেমন যেন সে ক্ষেপে গিয়েছিল। একটা দারুণ ক্ষ্যাপামিতে তাকে এমনি

করে মাঝে মাঝে পেয়ে বসে। ক্ষেপে গেলে তার বুকের জ্বালাটাও একটু একটু করে নিভে আসে।

এখন বুকের জ্বালাটা একটু কমেছে যেন!

কিন্তু বড়ো হাঁপিয়ে পড়েছে সে আজ। সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে। যেন সে সত্যিই লড়াই করে কোথা থেকে এলো।

বয়েস হয়েছে। না, সে আর পারে না। তাকে সাহায্য করবারও কেউ নেই তার।

দূর থেকে বাঁশির সুর শুনতে পায় সে। কে বাঁশি বাজায়?

এ নিশ্চয়ই বুধিয়া।

আবার বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে।

বাঁশির সুর লক্ষ্য করে সে এগোতে থাকে।

জেলের ছেলে হয়ে সে সমুদ্রে যাবে না। বসে শুধু বাঁশি বাজাবে, যাত্রার দলে চাকরি করবে? জাত-ব্যবসা ছেড়ে কিনা গুলামি করবে?

না, সে তা হতে দেবে না। সে আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে।

সকালে সে খুবই রাগ করেছিল। কিন্তু প্রকাশ করে নি। তার রাগ সারাদিন মনের মধ্যে গুম্‌রে ফিরেছে। এখন আবার বুধিয়ার বাঁশির সুর শুনতে পেয়ে সে যেন অন্তরে ফুঁসে উঠলো।

বাঁশির সুর লক্ষ্য করে সে এগিয়ে আসে।

বুধিয়া জানতে পারে নি, কিছুই বুঝতে পারে নি।

রাঘব হাত বাড়িয়ে টান মেরে বাঁশিটা কেড়ে নিতেই তার চমক্ ভাঙলো। যে সুরটা সে বাঁশিতে ধরেছিল, তা এখনো শেষ হয় নি।

এখনো যে মনের কোণে তার সেই সুরটা বেজে চলেছে।

সে কি করবে ভেবে না পেয়ে অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে বসে থাকে।

: সমুদ্দুরে যাবি না, বাঁশি বাজাবি, লয়? যাত্রার দলে গুলামি করবি? দাঁড়া। তোর বাঁশি বাজানো জন্মের মত ঘুচিয়ে দিচ্চি।

বুধিয়া মুখ তুলে তাকায়। এ কী করছে রাঘব? দুহাতে শক্ত

করে বাঁশিটাকে ধরেছে কেন? বুধিয়ার বুকের ভেতরটা যেন কি সর্বনাশের আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

: তুই রাগ করিস নি, বাপ। কাল আমি সমুদ্দুরে যাবো—

কিন্তু ততক্ষণে একটা আর্তনাদের মতো শব্দ করে বাঁশিটা দু খান হয়ে গেছে।

: ভেঙে দিলি বাপ্। আমার বাঁশিটা ভেঙে দিলি তুই?

কথাটা বলতে গলাটা চিরে গেল বুধিয়ার।

বাঁশির টুক্‌রো দু খানা বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাঘব বুধিয়ার গালে ঠাস্ করে একটা চড় মাড়লো।

চড় খেয়ে বুধিয়া কাঁদলো না। একটু শব্দও করলো না।

বালির ওপর শুয়ে-থাকা ধূসর অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলো।

রাঘব তাকে মেরেছে, সে জন্যে তার দুঃখ নেই।

কিন্তু বাঁশিটা তার ভেঙে দিল! বাঁশিটা তার নেই, ভেঙে গেছে— কথাটা সে কিছুতেই ভাবতে পারছে না। তার যে তাহলে আর কিছুই রইলো না।

কি নিয়ে তার দিন কাটবে?

যখন বিকেলের রোদ্দুরে রং বদ্‌লাবে, সমুদ্র চরের ওপর দীর্ঘশ্বাস মেলে দেবে, পলাশ বনের অন্ধকার থেকে একটা পাখি করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠবে, তখন সে কি করবে?

কি করে মন ধরে সে ঘরে বসে থাকবে?

সূর্য ডোবার সময় যখন সমুদ্র, আকাশ আর বালিচর রক্তিম আলোর নেশায় মাতাল হয়ে উঠবে, তখন আর তার বাঁশি বাজবে না।

সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

বহুদিনের সাথী বাঁশিটার সঙ্গে চিরদিনের মতো তার বিচ্ছেদ হয়ে গেল। বাঁশি আর তার বাজবে না।

রাতে ময়না বউ তাকে অনেক রকম করে সাধলো। তবু সে উঠলো না। ভাত খেলো না।

সে ভাত খাবে কি? সে আজ বড়ো ব্যথা পেয়েছে, বড়ো দুঃখ। তার জীবনের যে সব চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা আজ সন্ধেয় ঘটে গেছে।

ভোরে সে মংলার সঙ্গে ডিঙিতে গেল। মাঝ-দরিয়ায় ডিঙিতে বসে সে সারাক্ষণ শুধু ভাবলো তার অতিপ্রিয় বাঁশিটার কথা, কালকের ঘটনাটার কথা। ঘটনাটা এত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে, তার জন্যে সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। কোনদিন সে ভাবেনি যে, এমন ঘটনা কখনো ঘটতে পারে।

যে সুরটা সে বাজাচ্ছিল, তা সে বাজিয়ে শেষ করতে পারে নি। আর কোনদিন তা সে শেষ করতেও পারবে না।

দুপুরে বুধিয়া ঘরে ফিরলো মংলার সঙ্গে।

ময়না বউ অনেক সাধাসাধি করলো: খা তুই। না খেয়ে মরবি নাকি? ছাখ্, তোর জন্যে আমিও খেতে পারচি না।

কোন কথা না বলে বুধিয়া উঠে চলে যায়।

সারা বিকেল সে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো।

একটা কথাও বললো না সে কারো সঙ্গে।

কালকের ঘটনাকে ভুলবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলো সে।

সত্যিই তো, জেলের ছেলে সে। সারাজীবন তাকে সমুদ্রে জাল পেতে মাছ ধরতে হবে। তার কি বাঁশি বাজিয়ে দিন কাটানো চলে?

বাঁশিটা তার বাপ ভেঙে দিয়েছে। এবার সে জেলের ছেলের মতোই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঁশিটার কথা আর সে ভাববে না।

পলাশ বনের ওপারে, যেখানে সে রোজ বাঁশি বাজাতো, সেখানে যাবে না; সেদিকে তাকাবেও না। তাহলে যদি বাঁশিটার কথা মনে পড়ে যায়।

না, বাঁশিটার কথা সে আর ভাববে না।

গাঁ ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছে সে। বেলাও বড়ো বেশি নেই। সে আকাশে তাকালো।

আকাশের রং বদলাচ্ছে, পশ্চিম দিগন্তে তখন চলেছে সূর্যাস্তের রক্তিম আয়োজন।

পলাশ বনের দক্ষিণের বালিয়াড়িটার দিকে সে তাকাবে না।

কিন্তু সে নিজের ইচ্ছের কাছে হেরে গেল।

রাস্তার নারকেল গাছের পাতার ভেতর দিয়ে বুক-তোলপাড়-করা একটা সুর ভেসে আসে। কোকিলের ডাকে পলাশ বনের আত্মা গান গেয়ে ওঠে যেন। আকাশের রঙে রঙে এক মোহন গানের সুর শোনা যায়। সমুদ্র এগিয়ে এসে চরের বালির ওপর দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয়।

বুধিয়া নিজেরই অজ্ঞাতে কখন পলাশ বনের পাশ দিয়ে বালিয়াড়িটার কাছে চলে এসেছে। একবার ভাবে, ফিরে যাবে সে। কিন্তু কি যেন এক অন্ধ আকর্ষণে তাকে সেই দিকে টেনে নিয়ে চললো।

বালির ওপর তার প্রিয় বাঁশিটা দু টুক্‌রো হয়ে পড়ে রয়েছে।

একটা ব্যথা তার বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে গলাটাকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলো। আর চোখের কোণ দুটো বালি উড়ে-পড়ার মতো হঠাৎ কর্ কর্ করে উঠলো।

বাঁশির টুক্‌রো দুটোকে তুলে নিয়ে দুহাতে সে বুকের ব্যথাটার ওপর চেপে ধরে। বড়ো বড়ো চোখের পাতা ভিজে উঠলো। এদিকে সমুদ্র চরের বালির ওপর ঢেউ ভাঙছে, পশ্চিম আকাশ রঙে রঙে মাতাল হয়ে উঠেছে, পাখিরা ঘরে ফিরে আসছে, তীরের নারকেল গাছগুলো করুণ বিষন্ন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক তখনই একটা সুর বেলাভূমি, সমুদ্র আর আকাশের বুক নিঙ্‌ড়ে ভেসে আসে। এ যে সেই সুর, যা সে কাল বাজিয়ে শেষ করতে পারে নি। সেই বিদায়ের সুর, বিষাদের সুর—

বুধিয়া পায়ে পায়ে জলের ধারে এগিয়ে যায়। বাঁশির টুক্‌রো দুটোকে জোড়া দেয়। ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আনে। না, সে ওতে ফুঁ দিয়ে বাজাবার চেষ্টা করে না। পরম আদরে সে বাঁশিটার মুখে শেষ চুম্বন এঁকে দিল।

ভালোবাসার শেষ স্মৃতি চিহ্ন।

তারপর তাকে একটা ঢেউএর মুখে তুলে দেয়।

আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, আর কখনো আমার বুকের ব্যথা দিয়ে তোমার বুক ব্যথিত করে তুলবো না।

কি করি বলো, আমি যে জেলের ছেলে।

আমার যে বাঁশি বাজালে চলে না। বিদায় বন্ধু, বিদায়—

বুধিয়া আর পেছন ফিরে তাকায় না। বালির ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে আসে।

সামনেই তার কালকের অসমাপ্ত সুরটা গান হয়ে বেজে ওঠে :

তোর লেগে ঘর ছাড়লাম, সুখ ছাড়লাম
ছাড়লাম মুখের হাসি
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু
হৈলেন পরবাসী রে, বন্ধু রে—

বুধিয়া চেয়ে দেখে তার সাম্‌নে আর কেউ নয়—পদ্মবুড়ি।

কদিন সে পদ্মবুড়িকে অনেক খুঁজেছে। পায় নি। আজ বড়ো অসময়ে পদ্মবুড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। পদ্মবুড়ি আঁচল ভরে কুড়িয়েছে ঝিনুক। এই ঝিনুক পুড়িয়ে চুন হবে। চুন বিক্রি করে দুটো পয়সা পাবে পদ্মবুড়ি। ভিক্ষে ছেড়ে সে আজ কাল বোধ হয় এই করে বেড়ায়।

বুধিয়াকে দেখে সে গান ধরেছিলো। এই হলো তার গল্প-বলার ভণিতা। বুধিয়া পদ্মবুড়ির সাম্‌নে একটু দাঁড়িয়েই চলে যায়। গল্প শোনার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না তার ভঙ্গিতে।

কোথায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদ্মবুড়িকে বসিয়ে রেখে গল্প শুনবে।

তা নয়। পদ্মবুড়িকে গল্প আরম্ভ করতে না দিয়েই সে করুণ উদাস ভাবে চলে যাচ্ছে।

ঃ অরে আমার পাখি, চলে যাচ্চিস্ ক্যানে? গপ্‌পোটা শুনে যা—

বুধিয়া ফিরেও তাকায় না।

ঃ অ পাখি, আজ যে সেই গপ্‌পোটা শেষ করবো রে। যে গপ্‌পোটা তোর ভালো লাগে শুনতে, সেই গপ্‌পোর শেষটা শুনে যা—অ পাখি—

চরের বালির মতো দুটো ধূসর চোখ বুধিয়ার অস্পষ্ট ছায়াটার দিকে করুণ ভাবে চেয়ে থাকে।

আষাঢ় ফুরোলো।

শ্রাবণেরও কয়েকটা দিন হয়ে গেল। ক দিন পরে শ্রাবণও ফুরিয়ে যাবে।

ঢেউএর মালা কপালে নিয়ে রাঘব তবু পথ চেয়ে থাকে।

তাহলে বুলান নেই?

বারো বছর যে দেখতে দেখতে কেটে গেল। এই বারো বছরে বুলান ফিরলো না। আর যে ফিরবে তেমন ভরসা কই?

মাছমারির চোখে বুলান অনেক আগেই মরেছে। মাছমারির জেলেরা অনেকদিন আগেই ধরে নিয়েছে, বুলান আর ফিরবে না। কিন্তু রাঘব তা বিশ্বাস করেনি। তার স্থির বিশ্বাস, বুলান মরে নি। সে নিশ্চয়ই কোন চরে উঠেছে, ডাঙা খুঁজে পেয়েছে কোথাও। সেইখানে সে রয়েছে, চেষ্টা করছে ঘরে ফিরবার।

বারো বছর সে শুধু এই এক চিন্তাই করে এসেছে।

বুলান যদি কোথাও ডাঙা খুঁজে পেয়ে থাকে, তাহলে বারো বছরেও সে ঘরে ফিরতে পারলো না? রাঘবের বিশ্বাসের মাটি শিথিল হয়ে আসে।

বাঁ পায়ের তলায় বালি ভিজে উঠলো।

সমুদ্রের ঢেউ সেই পায়ের তলার বালিগুলোকে কুরে কুরে আল্‌গা করে দিল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে সে আবার সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে?

সে বারো বছর ধরে সমুদ্রের চরে চরে খুঁজেছে। একটা চুল বা এক টুক্‌রো হাড় কিছুই তার চোখে পড়ে নি। একটা দিনও সে বসে থাকে নি। সে খুঁজেছে, কেবল খুঁজেছে। সমুদ্রের হাঙরে কি তাকে সমস্তটাই খেয়েছে?

না। তা হতে পারে না।

বুলান যদি মরে যেত, তাহলে তার কিছু চিহ্ন অন্তত চরের বালির ওপর পাওয়া যেত।

বুলান মরে নি।

সে কি করে বিশ্বাস করবে যে বুলান মরেছে?

সমুদ্র বুলানকে খেয়েছে ভেবে সে এতদিন সমুদ্রকে গালাগাল করেছে, ঢেউকে মেরেছে লাঠির বাড়ি। তারও একখানা পা খেয়ে সমুদ্র তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সমুদ্রের কেন এই আক্রোশ?

সে তো কোন অপরাধ করেনি। প্রতি বছর গঙ্গার পূজো করেছে। মাছমারির গাঁয়ের জেলেদের কোন অনিষ্ট না হয়, তার জন্যে মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করেছে। সে তো কোন দোষই করেনি গঙ্গার কাছে।

তবু সমুদ্র তার বড় ছেলেকে খেল আর তার একটা পা খেয়ে তাকে চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দিল কেন?

সে গল্প শুনেছিল, মাছমারি গাঁয়ের কোন এক জেলে বহুকাল আগে নৌকোডুবিতে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন কেটে গেল, তবু আর ফিরে আসে না।

বাড়িতে ছিল তার বউ আর এক ছেলে। একদিন রাতে বউটা

স্বপ্ন দেখলো। মা গঙ্গা তার মাথার কাছে বসে বলছেন ঃ কাঁদিস্ না তুই। আমার পূজো কর। ও ফিরে আসবে।

পরের দিন বউটা তার স্বপ্নের কথা গাঁয়ের সবার কাছে বললো। সবাই তাকে বললো পূজো করতে।

বউটা পূজো করলো। সাত দিনের মধ্যে সেই জেলে ঘরে ফিরে এসেছিল।

কই, বারো বছরে রাঘব তো তেমন কোন স্বপ্নই দেখলো না।

গঙ্গার পূজো একবার কেন, বিশ বার করবে সে, যদি তার বুলান ফিরে আসে।

রাঘব চারদিকে তাকালো।

না, কেউ কোথাও নেই।

চরের ওপর শ্রাবণ সন্ধের একটানা অন্ধকার একটা কালো জালের মতো পড়ে আছে।

জলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। জলের ওপর খোঁড়া পা-টা রাখলো, বাঁ পায়ের হাঁটুটা মুড়ে নিয়ে এলো তার পাশে। পূজোর ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে বসলো সে। লাঠিটাকে কাঁধের ওপর রাখলো ঠেসান্ দিয়ে।

আবার একবার চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে নিল সে।

দু হাত জোড় করে এক আঁজ্‌লা জল ভরে নিয়ে কপালে ঠেকালো।

ঃ আমার বুলানকে ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে মা। তাকে কুথায় লুকিয়ে রেখেচিস, ফিরিয়ে এনে দে। তুই তো জানিস্, কুনোদিন আমি এমন ছিলাম নি। চিরদিন তোর পূজো করে এয়েচি। আজ ক্যানে তোকে গালি দি, লাঠির বাড়ি মারি, তা কি তুই জানিস্ না? বুকে বড়ো দুক্‌খু, বড়ো জ্বালা মা। বারো বছর বড়ো জ্বল্‌চি। বুকটা যে আমার পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্চে, তুই কি তা জানিস্ না? নিভিয়ে দে মা, এ আঙ্‌ড়া নিভিয়ে দে। বুলান আমার বড়ো ছেলে। ওকে তুই

ফিরিয়ে এনে দে। আমি ফের তোর পূজো দিব। সোব্খানে তোর কথা বলে বেড়াবো।

অন্ধকারের মধ্যে শুধু সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে চোখের জল মোছে।

না, কেউ দেখতে পায়নি তাকে। তার চোখের জল কেউ দেখতে পায় নি।

ধীরে ধীরে সে ঘরের দিকে ফিরে চলে।

পথে ঘনাই মোড়লের সঙ্গে দেখা। ঘনাই কোথাও গিয়েছিল, একটা কাঁটা ফুটেছে তার পায়ে। তাই একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই সে হাঁটছে। রাঘবের মনে হচ্ছে, সে যেন তাকে আর তার খোঁড়া পা-কে ভেংচি কাটছে।

ঘনাইর সঙ্গে রাঘবের অনেকদিন মুখ-দেখাদেখি বন্ধ, কথাবার্তাও বন্ধ। আজও রাঘব পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল। কি ভেবে সে থেমে যায়।

জিজ্ঞেস করে ঃ কুথায় গেচিলি ঘনাই ?

ঘনাই কথা বলবে কি বলবে না ভাবতে গিয়ে জবাব দিয়ে ফেলে ঃ

ঃ গাঁয়ের দিকে।

ঃ আমার ঘরে আয়।

ঃ ক্যানে ?

ঃ কথা আছে।

ঃ চল্—

দাওয়ায় এসে দুজনে বসলো। দেশলাই কাঠি জ্বেলে কাঠ কয়লা ধরিয়ে রাঘব তামাক সাজে।

ঃ তোর পায় কি হয়েচে রে ঘনাই ?

ঃ কাঁটা ফুটেচে একটা।

ঘনাই তাহলে তার খোঁড়া পা-কে ভেংচি কাটে নি। পায়ে তার সত্যিই হয়তো কাঁটা ফুটেছে।

কিন্তু সে ঘনাইকে এভাবে সন্দেহ করে কেন? ঘনাইকে যত মন্দ সে ভাবে, ঘনাই হয়তো তত মন্দ নয়। তামাক খেতে খেতে রাঘব বলে: বারো বছর তো হয়ে গেল। বুলান তো ফিরলো নি—

ঘনাই বলে: আমি বলেচি তো ও আর ফিরবে নি।....

: হুঁ—

অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। দূর-থেকে-ভেসে-আসা একটা ঢেউএর গোঙানি যেন!

রাঘব হুঁকোটা ঘনাইয়ের হাতে এগিয়ে দেয়।

ঘনাই জিজ্ঞেস করে: তাহলে তুই কি ঠিক করলি, মোড়ল?

: তোর কথাই রইলো, আর কি?

: হুঁ, আমাদের জাতে যখন রয়েচে, তখন আর—

: তাছাড়া মংলারও একটা বে দিতে হবে তো?

: আমি তাই বলতেচিলাম, কুথায় যাবি মেয়ে খুঁজতে? তার চে—

: হুঁ। কিন্তু এখন শাঙন মাস। এক মাস বাদেই খোরাকে টান পড়বে। ওদিকে ডিঙির দশা বেহাল। ওতে আর চলবে নি। গোক্‌লাকে কুনো মতে ধরা যাচ্চে নি। আর ধরতে পারলেও এখুনি ও লতুন ডিঙি দিবে, তেমন আশাও নাই। তাহলে এখন তো কিছু করা যাবে নি—

ঘনাই একটু ভেবে বলে: এখন না করা যায়, করবি নি। কিন্তুক এর পর তো খটিতে যেতে হবে। খটি থেকে ফিরলে না হয়, হবে। কি করা যাবে তা'লে? তবে গাঁয়ের লোক একটা আমোদ আশা করে, এই যা।

: তারা তা পাবে। এখন বড়ো ভাবনা, মংলা কি লিয়ে খটিতে যাবে। ডিঙিটায় এক্কেরে আর চলচে নি—

ঃ ময়না বউ কি বলচে ?

ঃ কি আর বলবে ?

অনেকদিন পরে দুজনে দাওয়ায় বসে তামাক খেল।

দেওয়ালে হুঁকোটাকে ঠেস দিয়ে রেখে রাঘব বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

ঘনাই জিজ্ঞেস করে ঃ এই জন্যে ডেকেচিস তুই ?

ঃ হুঁ। এ কথায় তোর একটা মত লিতে হবে তো। হাজার হোক, গাঁয়ের মোড়ল তুই এখন—

ঘনাই রাঘবের মুখের দিকে তাকায়। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পায় না। একটু থেমে সে বলে ঃ

ঃ আমি আগেই তোকে বলেচি তো—

ঘনাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

রাঘব দাওয়ায় বসে মনে মনে হাসে।

ঘনাইকে সে আজ কথাটা অন্যভাবে বুঝিয়ে দিল।

মংলার সঙ্গে ময়না বউর বিয়ে সে দেবে। কিন্তু এখন নয়। পৌষ মাসে মংলা আর বুধিয়া খটি থেকে ফিরে আসুক। তারপর মাঘমাসের দিকে দেখা যাবে। এই বলে রাঘব আরো ছ'মাস সময় নিয়ে নিল।

আরো ছমাস সে বুলানের জন্যে অপেক্ষা করবে।

আজ তো সে মা গঙ্গাকে পেন্নাম করে মিনতি করে বলে এলো। দেখি মা গঙ্গা যদি কৃপা করে, তাহলে হয়তো সাতদিনের মধ্যেই বুলান ফিরে আসতে পারে। সাতদিনে না আসে ছ মাসের মধ্যেও এসে যেতে পারে।

কিন্তু ময়না বউ যে এখন বিধবা।

বারো বছর পূর্ণ হবার দিন তার মাথার সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, হাতের শাঁখা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

ঘনাইর বউকে সেদিন ডাকা হয়েছিল। গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদেরও

ডাকা হয়েছিল। কেউ আসেনি। ময়না বউ নিজেই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললো। নিজেই হাতের শাঁখা ভেঙে ফেললো।

ময়না বউ সেদিন কেঁদেছিল। বুলানের সব স্মৃতি মুছে ফেলতে সে কেঁদেছিল। মংলা আড়ালে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল ঃ কাঁদ্‌চিস্‌ ক্যানে ? দুদিন বাদেই লতুন সিঁদুর, লতুন শাঁখা পরবি তো।

গাঁয়ের চোখে ময়না বউ এখন বিধবা।

এখন যদি বুলান ফিরেও আসে, তবে তাকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারবে না। গাঁয়ের মতামত নিতে হবে। সমুদ্রে বারো বছরের নিখোঁজ মানুষ গাঁয়ের মতে, মৃত। এখন তো তাকে সহজে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। গাঁয়ের সবাই যদি একমত হয়ে বলে, তাহলে আবার বিয়ে হবে। তবেই বুলানকে ময়না বউ ফিরে পাবে।

এখন ছ মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত।

ছ মাসের মধ্যে বুলান ফিরে আসে ভালো, নইলে যা হবার তাই হবে।

সবই অদেষ্ট।

নারকেল গাছের পাতার গায়ে বিকেলের বাতাস সুড়সুড়ি দিয়ে গেল। অমনি দরজার আড়াল থেকে ময়না বউ খিলখিল করে হেসে উঠলো।

মংলা ফতুয়াটা আনতে ঘরে ঢুক্‌তেই ময়না বউ তাকে দেখে জোরে হেসে ওঠে।

ঃ কি হয়েচে তোর ?

ময়না বউ তার হাত ধরে টানতে টানতে ঢেঁকিশালের দিকে নিয়ে যায়।

ঃ সেদিন রাত্তিরে আমি কি ভেবেছিলাম, জানিস ?

ঃ কি ?

ঃ ভেবেছিলাম, বুলান ফিরে এয়েচে। আমাকে ভয় দেখাতে ডিঙিটার পাশে লুকিয়ে আমার কাপড় ধরে টানচে—

ঃ অ। অই রাতের কথা বলচিস?

ঃ হ্যাঁ। তা'পর দেখি, অ—মা, তুই—

মংলার হাত ধরে হাসতে হাসতে ময়না বউ মাটিতে বসে পড়ে। হাসি চাপতে গিয়ে তার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মংলা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

হাসতে হাসতে ময়না বউ জিজ্ঞেস করে ঃ কি দেখচিস রে?

ঃ তোকে?

ঃ আর কতো দেখবি?

ঃ না। তোকে এখন আর দেখতে ভালো লাগচে নি।

ঃ ক্যানে রে? চক্ষে আর কারুর রঙ লেগেচে নি কি?

মংলা একটু চমকে উঠলো যেন।

ঃ তা লয়, তা লয়—

ঃ তাহলে?

মংলা বলে ঃ শাঁখা নাই, সিঁদুর নাই, ডুরে-পাড় শাড়ি নাই—

ঃ অ—

একটু থেমে ময়না বউ বলে ঃ দুদিন বাদেই তো তুই লতুন শাখা, লতুন সিঁদূর, লতুন শাড়ি কিনে এনে দিবি। তখন দেখিস্—

ঃ দিবই তো।

ঃ তাড়াতাড়ি দিস্। দেরি করিস্ নি। আমার বেশি দিন এভাবে থাকতে একদম ভালো লাগচে নি, বাপু।

মংলা হেসে বলে ঃ তোর আর এখন তর সইচে নি, লয় রে?

ঃ তর সইবে ক্যানে? বারো বছর তো কবে কেটে গেচে। তাহলে?

মংলা ঘরের ভেতর থেকে ফতুয়াটা এনে কাঁধের ওপর রাখে। ময়না বউ কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে ঃ কুথায় যাচ্চিস তুই?

ঃ মহিষাজোড়—

ময়না বউর মুখ শুকিয়ে যায়।

ঃ আবার মহিষাজোড় যাচ্চিস ?

মংলা বলে ঃ না গেলে যে এ ডিঙিতে আর চলচে নি বউ। কুনোদিন সমুদ্দুরে ডুবে মরে যাবো। আর ফিরবো নি—

মংলার মুখে চাপা দিয়ে ময়না বউ বলে ঃ থাক্। অলুক্ষুণে কথা আর তোকে বলতে হবে নি। কখন আসবি, বল্? না, সেদিনের মতন সারা রাত্তির ভাত লিয়ে তোর জন্যে বসে থাকতে হবে ?

ঃ ফিরতে একটু রাত্তির হতে পারে। বেশি রাত্তির হলে তুই খেয়ে লিস্ বউ—

ঃ না। ও আমি পারবো নি—

মংলা ফতুয়া কাঁধে বেরিয়ে যায়।

গোকুল গায়েন বিরক্তির সুরে বলে ঃ তোদের কি টাকা খরচের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা নেই ? কি করে আমার টাকা খরচ করাবি, কি করে আমাকে ঠকাবি—এই সব চিন্তা ছাড়া কি অন্য কোন চিন্তা করতে পারিস্ না তোরা ? তোরা সব কি রে ? এ্যাঁ ?

মংলা বলে ঃ তোকে ঠকাচ্চি কুথায় ? ডিঙিটা এক্কেরে ঝাঁঝ্রা হয়ে গেচে। আর চলচে নি ওতে। ওটা লিয়ে একটা ডিঙি দিবি তাই বলতে এয়েচি। ঠকাতে এয়েচি নি কি ?

গোকুল নিচের সারির দাঁত বের করে মংলার মুখের দিকে সাপের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে একটু চেয়ে থাকে।

ঃ কথাটা তোর গায়ে বিঁধে গেল নাকি রে ? তুই কি জানিস, নতুন ডিঙি চাইলেই পাওয়া যায় না ?

একটু থেমে সে বলে ঃ তিনটে মামলা ঝুলছে আমার নামে। তিন-তিনটে ফৌজদারী কেসে শালারা আমাকে লট্‌কে দিয়েছে।

মামলা চালাতে আমার অনেক টাকার দরকার। উকিল, মোক্তার, ঘুষ, সাক্ষী-সাবুদ—ওসব তুই বুঝবি না। ডিঙি এখন দিতে পারবো না।

মংলা গলাটা একটু নরম করে বলেঃ কিন্তুক সামনেই আশ্বিন মাস। কাত্তিকেই খটিতে যেতে হবে। ডিঙি নাহলে যে আমরা মরে যাবো, বাবু। খটির তিন মাসেই আমাদের বছরের বারো আনা খোরাক্ হয়ে যায়—সে তো তুই জানিস।

গোকুল গাঁয়েনের মন ভিজলো না।

মুখ ভেংচিয়ে সে বলেঃ তবে আমি কি করবো? আমি কি তোর জন্যে চুরি করে আবার জেলে যাবো নাকি? এ্যাঁ?

মংলা আবার বলেঃ যা হোক করে একটা ডিঙি দিতে কিপা হয় বাবু। নাহলে মারা পড়বো।

গোকুল তেড়ে ওঠেঃ মারা পড়বি তো মরবি। আমি কি করবো? ডিঙি বানাতে হবে। বানাতে গেলে টাকা খরচ হবে। টাকা তো তোর জন্যে ঘরে বেঁধে রাখি নি যে ডিঙি চাইতে এলি, সঙ্গে সঙ্গে বাক্স থেকে বের করে এনে ডিঙি বানিয়ে তোকে দিয়ে দেব।

মংলা গোকুল গায়েনের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। বারো বছর আগে তার বাপ ডিঙি চাইতে এসেছিল। সে আসে নি। কিন্তু শুনেছিল সব কথা।

সেই জন্যেই সে এতদিন আসতে চায় নি। অথচ না এসেও যে তার উপায় ছিল না। নতুন ডিঙি না হলে যে তার চলবে না। খটির মরশুমে যদি সে খটিতে যেতে না পারে, তাহলে সারা বছর তারা খাবে কি? গাঁয়ের সবাই খটিতে যাবে, শুধু তারাই যেতে পারবে না।

ঃ বারো বছরের মদ্দে তো তোর কাছে একবারও আসি নি—

গোকুল বলেঃ তাই বারো বছর আমার চোখে ঘুম আসে নি।

লোকটা কী! মংলার বুকের ভেতর রাগে, ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। সে বলে ওঠেঃ ডিঙি দিলে তুই মাগ্‌না দিবি নি কি? বছরে দু কুড়ি টাকা ভাড়া—

ঃ ভাড়া দিবি নি তো মুখ দেখতে তোকে ডিঙি দেব আর কি ?

মংলা কিছু না বলে দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে । বলে ঃ তাহলে অই ডিঙি যদি ডুবে যায়, তোকে একটা পয়সাও দিব নি কিন্তুক—

ঃ দিবি নি মানে। তোর বাপ্ এসে পায়ে ধরে দিয়ে যাবে—

মংলা উঠে চলে আসছিল। পেছনে গোকুলের কথাটা তার কানে এসে বাজলো।

সঙ্গে সঙ্গে মংলা ঘুরে দাঁড়ালো। মাথার ভেতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো তার।

ঃ এ্যায় !—

চোখ দুটো তার ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন।

ঃ বাপ্ তুলচিস ক্যানে ? ভাড়া দিয়ে ডিঙি লিই। মাগ্না লয়। হ্যাঁ—

তার সেই চেহারা দেখে গোকুল গায়েন একটু ঘাব্ড়ে যায়। সে এতটা আশা করে নি। হঠাৎ সে কুঁক্ড়ে এতটুকু হয়ে গেল যেন। বিড় বিড় করে কি বলতে যাচ্ছিল।

ধমক দিয়ে মংলা বলে ঃ ফের যদি কুনো কথা বলিস, অই পুকুরে তোকে জ্যান্ত পুঁতে দিব। হ্যাঁ—

দুম্ দুম্ করে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে মংলা চলে আসে।

মনটা তার বিষিয়ে গেছে। কোন কথা ভাবতেই তার ভালো লাগছে না।

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে তার মেজাজটা আজ ঠিক রাখতে পারে নি। সে কখনো কোন কারণেই এ ভাবে মেজাজ খারাপ করে না। কিন্তু আজ তার মনের ভেতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। হয়তো তার হাতের আঙুলগুলো গোকুল গায়েনের গলায় আজ কাঁকড়ার দাড়ার মতো আঁকড়ে বসতো। যাক্ সে যে গোকুলের গায়ে হাত দেয় নি, ভালোই করেছে। তাহলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।

কিন্তু এখন কি হবে ?

গোকুল তো ডিঙি দেবে না। কি করে তাহলে চলবে তাদের ?

আশ্বিনের শেষেই হয়তো খটির জন্যে তাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। সবাই দল বেঁধে যাবে যে যার ডিঙিতে। আর ডিঙি নেই বলে সে যেতে পারবে না। মাছের মরশুমে সে নিষ্কর্মার মতো ঘরে বসে থাকবে। খটি থেকে সবাই মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে ফিরবে। আর সে সেইদিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিল। সামনেই বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ বেঁকে গেছে। আর একটা পথ ভ্যাড়া বাঁধের দিকে চলে গেছে ঈষৎ বেঁকে।

একটু ভেতরে মৈনিমাসির ঘর।

বনের গাছের ফাঁক দিয়ে ঘরের চাল দেখা যায়।

আসার সময় সে ঘরটাকে একটু পাখির চোখে-দেখা দেখেছিল। ভেবেছিল, গোকুল গায়েনের একটা মুখের কথা নিয়ে ফিরবার পথে সে একবার সোহাগীর সঙ্গে দেখা করে যাবে।

এখন আর তার সোহাগীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে না। মনটা বড়ো ভেঙে গেছে তার। আসার পথে সোহাগীকে বলবে বলে কতো কথাই সে ঠিক করেছিল।

এখন সেই সব কথার রং একেবারে মুছে গেছে।

কিছুই ভালো লাগছে না তার।

সে একবার ভাবে, সোহাগীর সঙ্গে দেখা না করেই সে ফিরে যাবে। কিন্তু মন মানলো না। পা দুটো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সোহাগীদের কুঁড়ের দিকে চলতে থাকে।

সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই।

বনের পাতায় সোনালি রোদ্দুর পিছলে পড়ছে। পাখিদের গলায়ও গোধূলির গান বাজতে সুরু করেছে। বনের ভিজে ভাদুরে গন্ধ এরই মধ্যে বাতাসকে ভারি করে তুলেছে।

সোহাগী কলসীতে জল নিয়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

কাঁকাল বেঁকিয়ে সমস্ত দেহটাকে গোধূলির ম্লান আলোয় দুলিয়ে দিয়ে একটি ছায়ার রেখার মতো সে ঘরে ফিরছিল। মংলার পায়ের শব্দ শুনে সে পেছন ফিরে তাকায়।

দু পাশে বেড়ার গায়ে ঝিঙেগাছ লতিয়ে উঠেছে। গোধূলির মিহি ছায়ায় স্নান করে তাতে রাশি রাশি ঝিঙে ফুলের মেলা বসে গেছে।

আসন্ন সায়াহ্নের সোনালি আলোয় অজস্র ঝিঙে ফুলের রঙিন সমারোহের মধ্যে সোহাগীকে অপূর্ব দেখায়।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চকিতে সোহাগীর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

ঃ অ, তুই? তুই এয়েচিস? আয়—

মংলা ক্লান্ত পায়ে বিষণ্ণ মুখে এগিয়ে যায়।

সোহাগী বলে ঃ আজ সকাল থেকে আমার মনটা কেমন করছিল। ও আমি তোকে বুঝাতে পারবো নি। বাঁ চোখটা নাচছিল। তাই মন বলছিল, তুই আসবি—

সোহাগী ঘরের ভেতর কলসী নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এলো। মংলাকে বসতে পিঁড়ি দিল, পান দিল।

ঃ জানিস? মাসি রোজ ঘরে ফিরে এসে তোর কথা বলে। আমার যে কী লজ্জা করে, কি বলবো। আমি যে তোর কথা শুনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি, মাসি তা টের পেয়েছে—

মংলা কোন কথা না বলে পান চিবোতে থাকে।

সোহাগী বলে ঃ মাসি তোকে কিছু বলে না?

ঃ না।

মংলা সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

সোহাগী ফিক্ করে হেসে ওঠে।

ঃ সেদিন তো তুই চলে গেলি। মাসি ঘুম থেকে উঠে আমাকে খুব বকলো। বললো, ক্যানে তুই যেতে দিলি? ওকে থাকতে বললি

নি ক্যানে? আচ্ছা বল, আমি তোকে থাকতে বলি নি? তুই যদি যাস্, আমি কি তোকে আমার আঁচলে গেরো দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি? এ্যাঁ?

সোহাগী নিজের মনে হাসতে থাকে।

সোহাগী অনেকক্ষণ ধরে মংলাকে দেখছে। অনেক কথা বলে তাকে হাসাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মংলা একবারও হাসে নি। তার যেন কি হয়েছে?

চোখে মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

গোধূলির ঘনীভূত আলোর মতো তার মুখটা বড় বেশি থম্ থম্ করছে।

সোহাগী জিজ্ঞেস করে : তোর আজ কি হয়েচে বল দি নি?

: কিছুই হয় নি তো—

: মিছে কথা বলবি নি। কি হয়েচে বল্। হাসচিস্ নি, কথা বলচিস্ নি, আমার কথাও ঠিক মতন শুনচিস নি। কিছু একটা হয়েচে তোর—

মংলা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লো।

গোকুল গায়েনের কাছে গেচিলাম—

সোহাগী তার ডানহাতের তর্জনী তুলে বলে : তাই বল্। নাহলে তোর মতোন মনিষ্যি এমন চুপচাপ থাকে। মুখটা কালোহাঁড়ি মেঘের মতন গুম্ হয়ে আছে। গোকুলের সাথে দেখা হয়েচে?

: হুঁ, হয়েচে—

: তুই ওর সাথে মারামারি করে এয়েচিস্ নি কি?

মংলা সোজা হয়ে বসে।

: না, মারামারি করি নি। ওকে মারতে পারলে ভালো হতো—

: ক্যানে রে?

সোহাগীর মুখটা যেন খুশিতে ভরে যায়।

: কথায় কথায় ও আমার বাপ তুললো। আমি বললাম,

ফের কথা বলেচিস যদি, তোকে পাশের ডোবায় পুঁতে দিয়ে আস্‌বো।

ঃ বললি ?

ঃ বলবো নি ?

ঃ ও কি বল্‌লে রে ?

ঃ বল্‌বে কি ? কথা বল্‌লেই জিভ টেনে ছিঁড়ে দিতাম নি।

সোহাগী হেসে কুটি কুটি হয়।

মংলা আবার একটা ভারি নিশ্বাস ছাড়লো।

ঃ কিন্তুক—

সোহাগী তার মুখের দিকে তাকায়। মুখটা তার রাতের মতো কালো হয়ে উঠেছে।

একটু থেমে মংলা বলে ঃ মাছ-ধরার ব্যবসা আর আমার হবে নি—

ঃ ক্যানে ?

ঃ গোক্‌লা লতুন ডিঙি দিবে নি বলে দিয়েচে। ভাঙা ডিঙি লিয়ে সমুদ্দুরে যাওয়া আর চল্‌বে নি। এক একদিন ভয় হয়—

ঃ ভয় ক্যানে ?

ঃ ভয় হয়, অই ডিঙি লিয়ে হয়তো আর ডাঙ্গায় ফিরতে পারবো নি।

সোহাগী শিউরে উঠলো। বলে ঃ বলিস্ নি, বলিস্ নি। আমার বুকটা কেমন করে উঠচে।

উঠোনে তখন আলো নিভে আসছে। বনের ওপারে চলেছে সূর্যাস্তের বিপুল আয়োজন।

সোহাগী জিজ্ঞেস করে ঃ গোক্‌লা কি বল্‌লো ?

ঃ কতো কী! ডিঙি দিতে পারবো নি। টাকা নাই। মামলা চলচে। জেল হতে পারে। এমনি কতো কি ?

সোহাগীর মুখটাও থম্ থম্ করতে থাকে।

ঃ একটা কথা কি জানিস্ ?

ঃ ?

ঃ সামনেই আশ্বিন মাস। আশ্বিনের শেষাশেষি খটিতে যেতে হবে। সারা বছরের বারো আনা খোরাক্ খটির তিনটা মাসেই হয়ে যায়। গাঁয়ের সব্বাই খটিতে যাবে আর আমার ডিঙি নাই বলে যেতে পারবো নি। দুক্খু হয় কিনা বল্ দি নি—

সোহাগী মাথা নাড়ে। দুঃখ হবে বৈকি? এ যে তার জীবন-সমস্যা। মরা-বাঁচার কথা।

মংলা বলে ঃ গত বছরের খটির টাকা খরচ হয়ে গেচে। টাকা থাকলে—

সোহাগী মুখ তুলে তাকায়।

ঃ কি করতিস তাহলে তুই?

ঃ লতুন ডিঙি বানিয়ে লিতাম। গোক্লার ভাঙা ডিঙি ফিরৎ দিয়ে বলতাম, লে তোর পচা ডিঙি মাথায় করে লিয়ে যা। তোর ডিঙিতে কুকুরেও আর—

সোহাগীর মুখের দিকে চেয়ে মংলা থেমে যায়।

ঃ ও সব কথা বলে আর কি হবে, বল্? টাকা তো নাই। বল্লে দুক্খু বাড়ে—

মংলা নিজের মনে একটু হাসে। সন্ধের নিভে-আসা আলোর মতো আর হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

সোহাগীর সারা মুখে তখন একখানা রাত্রি কাঁপছে নিবিড় হয়ে।

ঃ ধর্, তোকে যদি কেউ টাকা দেয়—

ঃ ক্যানে? দিবি তুই?

ঃ যদি দি—

ঃ মেয়ে মনিষ্যির টাকা লিব নি।

ঃ আবার তেজও আছে ষোল আনা। টাকার অঙ্গে মরোদ কি মেয়েমনিষ্যির নাম লিখা থাকে নি কি?

ঃ তা লয়, তা লয়—

ঃ তাহলে?

মংলা সোহাগীর মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

দু জনের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে ওঠে। সোহাগী জিজ্ঞেস করে: কতো টাকা লাগবে তোর বল্ দি নি—

মংলা মুখ নিচু করে বলে: তুই অত টাকা দিতে পারবি নি, সুহাগী—

: বল্ না তুই, কত টাকা হলে তোর হবে।

: ধর্ তিন শো—

সোহাগীর মুখটা ভারি হয়ে ওঠে। বলে: দিব—

: দিবি? অত টাকা তুই দিবি?

সোহাগী ঘাড় নাড়ে।

: দিতে পারবি তুই? কোথায় পাবি তুই এত টাকা?

সোহাগা কিছু না বলে ঘরের ভেতরে উঠে যায়।

মংলা স্তম্ভিত হয়ে সন্ধের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

সোহাগী আজ তাকে অবাক করে দিয়েছে। সন্ধের এই তরল অন্ধকারে সোহাগীকে কতো বড়ো মনে হচ্ছে তার। গোকুল গায়েনের বাড়ি থেকে সে বড়ো হতাশ মন নিয়ে ফিরে এসেছিল। তার চোখের সামনে একখানা পুরু অন্ধকার নেমে এসেছিল। গোকুল গায়েনকে তো সে চটিয়ে দিয়ে এলো। কিন্তু তাকে সংসার চালাতে হবে তো? কি করে সংসার চালাবে?

ভাঙা ডিঙিতে ভাঙা মন নিয়ে সে চলবে কি করে? সত্যি, সোহাগী তাকে বাঁচালো। তার কাছে সে চির-জীবনের মতো ঋণী থেকে গেল।

সোহাগী একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

: লে, দেখে লে—

মংলা একবার সোহাগীর মুখের দিকে তাকালো। তার মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মংলা পুটলিটা খুলেই চমকে ওঠে

: সুহাগী, এ যে গয়না—

: গয়না বেচলেই টাকা হবে।

মংলা পুঁটলিটা সরিয়ে রেখে দেয়।

: না, এ আমি লিতে পারবো নি—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মংলা সোহাগীর কাছে হেরে গেল। বড়ো জেদী মেয়ে সে। তার জিদের কাছে মৈনিমাসিকেও মাঝে মাঝে হার মানতে হয়। মংলাকেও হার মানতে হলো। মংলাকে গয়না নিতে হলো।

: সুহাগী, এ গয়নাগুলো আমি বেচবো নি—

: তাহলে কি করবি তুই ?

: বন্ধক দিব। খটি থেকে ফিরে এসে খোলসা করে এনে তোর গয়না তোকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

: বেশ তাই দিয়ে যাস্।

মংলা বলে : কিন্তুক—

: ?

: মাসি যদি জানতে পারে, যদি তোকে বকে, তাহলে ?

: জানতে পারলে তবে তো বকবে।

একটু থেমে সে বলে : খটি থেকে ফিরে তুই তো আবার ফিরৎ দিয়ে যাবি বল্‌চিস্।

: ধর, যদি ফিরৎ না দি ?

: আমি তো ফিরৎ মাগ্‌তেচি নি। তুইই ফিরৎ লিয়ে আসবি, বলচিস্—

মংলা সোহাগীকে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সোহাগীর হাতটাকে মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়ে সে শুধু বলে : যদি আমি আর না ফিরি ?

তার মুখে চাপা দিয়ে সোহাগী বলে : যাবার আগে একবার আসিস্, কেমন ?

: আসবো।

ঃ কবে আসবি বল্ ?

ঃ আসবো।

মংলা রাস্তায় এসে যখন দাঁড়ালো, তখন অন্ধকার থম্ থম্ করছিল। ভ্যাড়া বাঁধের রাস্তা ধরে সে মাছমারি গাঁয়ের দিকে চলতে থাকে। গয়নার পুঁটলি নিয়ে একা একা আসতে তার ভয় করছিল। কিন্তু তার সকল অনুভূতিকে ছাপিয়ে উঠেছিল একটি চঞ্চল মুখ এবং একটি মিষ্টি মধুর নাম।

সোহাগী তাকে বিস্মিত করে দিয়েছে। তার মনে গভীর একটি দাগ কেটে দিয়েছে, যা কোনদিন কোন মতে মুছে যাবে না।

আকাশে তাকায় মংলা।

এক ফালি মেঘের পাশে জ্বল্ জ্বল্ করে হাসছে সন্ধে-রাতের তারা। কেমন দরদ-মাখা চোখে সে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে।

মংলার মনে হয়, এই তারার সঙ্গে সোহাগীর একটা আশ্চর্য মিল আছে।

যতই সে মাছমারি গাঁয়ের দিকে এগোয়, সমুদ্রের হা-হুতাশও তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্ধকার ফুঁড়ে সে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ঘরে গেল না। তাহলে তাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কি দরকার ওসব ঝামেলায় গিয়ে ?

সে সোজা টেকো পাত্রের দোকানে গিয়ে হাজির হয়।

ঝাঁপ ফেলে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল টেকোপাত্র। মংলার ডাকে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

টেকো পাত্র মংলাকে চেনে। ভালোভাবেই চেনে।

তবু সে তার হাতে এত গয়না দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মংলা কারো গয়না চুরি করে আনে নি তো ?

মংলা তাকে বলে ঃ ভয় পাস্ নি। বিক্রি করবো নি। বন্ধক রাখতেচি। খটি থেকে ফিরে এসে মাঘ মাসে ফিরৎ লিব।

চুরি-করা গয়না হলে মংলা বন্ধক দেবে কেন? সোজা বিক্রি করে দিত। টেকো পাত্র একটু আশ্বস্ত হলো।

রাঘব সেদিন রাতে দাওয়ায় শুয়ে মংলাকে জিজ্ঞেস করেছিল: কি হলো?

মংলা রাঘবের এমনি একটা প্রশ্ন আশা করছিল। মনে মনে সে উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। উঠোন-জোড়া অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বলে: হলো নি?

: কি বললো?

: ডিঙি দিতে পারবে নি।

: পারবে নি?

: না।

রাঘব কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় পড়ে রইলো। অন্ধকারে আবার রাঘবের গলা ভেসে এলো: তা'লে কি হবে?

অন্ধকারের ওপার থেকে মংলার গলা শোনা যায়: ডিঙি বানিয়ে লিব।

ডিঙি বানাবে মংলা?

মাছমারির জেলেদের কেউ কখনো যা করে নি। মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মংলার? ডিঙি বানাতে কতো টাকার দরকার তা বুঝি মংলা জানে না। অতো টাকা সে পাবে কোথায়?

: কিন্তুক টাকা পাবি কুথায়?

: কতো টাকা লাগবে, বল্ দি নি—

: অনেক টাকা। তিন চার শোর কম লয়—

মংলা একটু থেমে বলে: টাকার কথা ভাবতে হবে নি। কাল একবার চন্দর মিস্তিরিকে ডেকে আনবি বাপ, বুঝলি?

রাঘব অবিশ্বাসীর চোখে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে।

সারা মাছমারি গাঁয়ের কারোর যা নেই, তার তাই হবে। নিজস্ব ডিঙি হবে তাদের। একখানা ডিঙির মালিক হবে তারা। মহিষা-জোড়ের গোকুল গায়েনের ডিঙি আর তারা ভাড়া করবে না। মাছমারি গাঁয়ের জেলেরা তার দিকে একটা সম্ভ্রমের চোখে তাকাবে। কতোদিন তার এমনি একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু কোনদিন সে তাকে প্রাধান্য দেয় নি। অসম্ভব ভেবে তার পায়ের তলায় মাথা কুটেও মরে নি বা কারো কাছে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তা প্রকাশও করে নি।

আজ মংলা তার মনের আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়ে যেন মুখর করে তুল্‌লো।

সত্যি, মংলা যদি তা করতে পারে, তবে কাজের মতো একটা কাজ করবে। তার উপযুক্ত ছেলেরই কাজ।

আহা, আজ যদি বুলান থাকতো—

দাওয়ার অন্ধকারে একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ঘুরপাক্ খেতে খেতে একসময় কোথায় মিলিয়ে যায়।

আহা, আজ বুলান যদি থাকতো!

পরের দিন বিকেলে চন্দর মিস্তিরি এলো।

পাকাপাকি কথা হয়ে গেল।

কাঠ, পেরেক, পাট, আলকাত্‌রা—সব সে কিনে আনবে। এখন তাকে একশো টাকা আগাম দিতে হবে। আর যা লাগে, পরে পরে দিলে চলবে। তবে সবশুদ্ধ্‌ তিনশো টাকার বেশি লাগবে না।

তাই হলো।

মংলা টেকো পাত্রের কাছ থেকে একশো টাকা এনে চন্দর মিস্তিরির হাতে দিল। বাকি টাকা টেকো পাত্রকে গুছিয়ে রাখতে বলে এলো।

রাঘব একেবারে তাজ্জব বনে গেল।

সে যা ভাবতে পারে নি, মংলা তাই করতে চলেছে।

ঘরের ভেতর পা দিতেই ময়না বউ মংলাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ সত্যি ? নতুন ডিঙি আমাদের বানানো হবে ?

ঃ হবে—

মংলা সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

ঃ ওরে বাপ, গাঁয়ের লোকের সামনে আমি কেমন করে বেরুবো রে ?

ঃ ক্যানে ?

ঃ ক্যানে আবার ? সব্বাই বলবে, ও ডিঙির মালিকের—

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে ময়না বউ।

মংলা বলে ঃ না রে না, তোকে ওকথা কেউ বলবে নি—

ঃ তুই জানিস্ নি গাঁয়ের মনিষ্যিদের। ওরা জানতে পারলে আমার ঘর থেকে বেরুনোই দায় হবে।

ঃ আমি বারণ করে দিব।

ঃ না না। বারণ করতে যাবি ক্যানে তুই ? তারা বলবে, একশো-বার বলবে—তাতে তোর কি ?

মংলা তার দিকে চেয়ে থাকে। ময়না বউ গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নেয়।

ঃ তুই অমন করে আমার দিকে তাকাস নি বাপু।

ঃ ক্যানে রে ?

ঃ আমার কেমন লাগে—

ঃ কেমন লাগে রে ?

ঃ বলতে পারবো নি।

ময়না বউ ঘরের কাজে চলে যায়।

গাঁয়ে খবরটা সময়মতো ছড়িয়ে পড়লো। শুনে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল।

মংলা এতো টাকা পেল কোথায় ?

অনেকে টেকো পাত্রের কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে গেছে। কিন্তু টেকো পাত্র বড়ো শক্ত লোক।

সে বলে দিয়েছে ঃ তাই নাকি ? আমি তো কিছু জানি না।

ফলে মাছমারি গাঁয়ে একটা গুজব রটে গেল।

মংলা নাকি মাছমারির চরে এক বাক্স টাকা পেয়েছে। সমুদ্রের ঢেউতে বাক্সটা ভেসে এসেছিল, মংলা দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে যায়। ভেঙে দেখে, ভেতরে শুধু টাকা আর টাকা।

কতো টাকা তার লেখাজোখা নেই।

তারপর থেকে মাছমারির চরে সকাল-সন্ধেয় অনেকে টাকার বাক্সের খোঁজে নিজের মনে ঘুরে বেড়ায়।

ঘুরে বেড়ায় রাঘবও।

সে টাকা খোঁজে না। খোঁজে বুলানের কোন চিহ্ন। বুলান যে বেঁচে নেই, তার কোন প্রমাণ।

যদি কোন প্রমাণ না পায়, তবে বুলান যে মরেনি, তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তাহলে মংলা আর ময়না বউকে আরো কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

রাঘব সেদিনও মাছমারির চরে ঘুরছিল।

ঘুরছিল আরো অনেকে। মাছমারি গাঁয়ের বুড়ো, বুড়ি, ছেলে মেয়ের দল। পায়ে বালি খুঁড়ে সবাই খোঁজে একটা জিনিস—টাকা। আর রাঘব খোঁজে কোন স্মৃতি, যা না পেলে সে মনে প্রাণে খুশি হয়।

ঃ হেই মা গঙ্গা, যেন না পাই—

চড়া রোদ্দুর উঠেছে আজ।

মাছমারি গাঁয়ের ডিঙিগুলো এখনো ঘরমুখো হয় নি।

রোদ্দুরে পুড়ছে মাছমারি চরের বালি। আর পুড়ছে মাছমারি গাঁয়ের মানুষগুলো টাকার বাক্সের খোঁজে।

রাঘবের লাঠিতে ঠক্ করে কি একটা শব্দ হলো।

রাঘব খোঁড়া পা-টা গরম বালির ওপর রেখে হাত দিয়ে কি একটা তুলে এনে তার ঝাপ্সা চোখের সামনে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে এক দল ছেলে মেয়ে ছুটে আসে রাঘবের দিকে।

রাঘব তাদের দেখে জিনিসটা ট্যাঁকে গুঁজে নেয়।

ছেলে মেয়ের দল চেঁচিয়ে ওঠে: বুড়ো পেয়েচে—

রাঘব লাঠি নিয়ে ওদের দিকে তেড়ে যায়।

ছেলে মেয়েরা আরো জোরে চেঁচায়: পাগ্‌লা বুড়ো পেয়েচে, পাগ্‌লা বুড়ো পেয়েচে—

রাঘব মাথা ঠিক রাখতে পারলো না। হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারলো ওদের দিকে।

না, কারো গায়ে লাগে নি।

কিন্তু ওরা আরো মজা পেয়ে গেল। রাঘব লাঠিটাকে কুড়িয়ে নেবার জন্যে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে এগোয়।

তা দেখে ওরাও রাঘবকে ঘিরে এক পায়ে লাফাতে লেগে যায়। চেঁচিয়ে বলতে থাকে: পাগ্‌লা বুড়ো খেপেচে, পাগ্‌লা বুড়ো—

রাঘব ওদের তাড়া করে।

সবাই দূরে সরে গেলে রাঘব চুপি চুপি ট্যাঁকের জিনিসটা বের করে আনে।

এক টুকরো হাড়!

রাঘব ভালো করে দেখে। এটা কি মানুষের হাড়? না, মানুষের নয়।

তার বুকটা হালকা হলো যেন।

সে টান মেরে ওটাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

একটা দিনক্ষণ দেখে চন্দর মিস্তিরি ডিঙির কাজ আরম্ভ করে দিল।

মাছমারির চরের বালির ওপর বালিয়াড়ির কোল ঘেঁষে চন্দর মিস্তিরির কাজ চলে। সকাল থেকে সন্ধে চলতে থাকে তার অবিশ্রান্ত কাজ।

তারি মধ্যে কোনদিন বৃষ্টি নামে।

মংলার খটিতে নিয়ে যাবার হোগ্‌লাকে চন্দর মিস্তিরির মাথার ওপর মেলে দিতে হয়। তার নিচে বসে চন্দর মিস্তিরি কাঠ চেলাই করে, কাঠ কাটে কিংবা পেরেক ঠোকে।

যন্ত্রের মতো চলতে থাকে তার কাজ।

রাঘব সমুদ্রের চরে চরে ঘোরার ফাঁকে চন্দর মিস্তিরির কাছে এসে বসে। দু একটা কথা বলে, তামাক সাজে, নিজে খায়, চন্দরকে খাওয়ায়। আবার কোথায় চলে যায়। মাঝে মাঝে সে বসে চন্দর মিস্তিরির কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।

কাজের ফাঁকে চন্দর বলে ঃ অ বুড়ো, তোর ছেলেরা কিন্তুক একটা কাজের মতো কাজ করলো—

ঃ হুঁ—

ঃ যাই বল্, নিজের ডিঙিতে মাছ ধরে খুব আরাম, লয় রে ?

ঃ আরাম লয়, আবার ! তোর নিজের তুরপুন্, বাটালিতে কাম করে আরাম হয় না ?

ঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেচিস্—

ঃ আর যদি পরের জিনিস লিয়ে কাম করতে হয় ?

চন্দর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে থাকে।

ঃ ঠিক বলেচিস্।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো রৌদ্রোজ্জ্বল, মেঘ-মলিন দিন কেটে গেল।

মাছমারির চরের ওপর দিয়ে কতো পাত্‌লা মেঘের ছায়া ভেসে গেছে, হেসে উঠেছে কতো রৌদ্রালোকিত দিন। বৃষ্টির সজল পর্দা দুলিয়ে ঘনিয়ে এসেছে কতোদিন ঘন কালো মেঘের দল। তারি মাঝখানে সমুদ্র কতোবার ঢেউ ভেঙেছে, হেসেছে, কেঁদেছে ; কতোবার রাগে গর্জে ফুঁসে উঠেছে। মাথার ওপরে আকাশ কতোবার রূপ বদ্‌লেছে, কতোবার হেসেছে, কেঁদেছে।

চন্দর মিস্তিরির কাজেও বিরাম নেই।

সে পুরো দু মাস ধরে খেটে ডিঙিটার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। আর সামান্য কাজ বাকি।

সেদিন বিকেলে মংলা আর বুধিয়া চন্দর মিস্তিরির পাশে বসে দেখছিল তার কাজ।

বালিয়াড়ির ওপর থেকে ঘনাই মণ্ডলের ডাক এলো। ডাক শুনে মংলা সেইদিকে এগিয়ে যায়। বুধিয়াও সেইদিকে চেয়ে থাকে। ঘনাই মংলাকে কি বলে ব্যস্তভাবে চলে যায়। মংলা ঠায় মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুধিয়াকে ডাকে : বুধিয়া শুনে যা—

বুধিয়া কাছে এসে দাঁড়ায়।

: চল্ যেতে হবে—

: কুথায় ?

: পদ্মবুড়ি মরেচে। পোড়াতে যেতে হবে।

পদ্মবুড়ি মারা গেছে ?

বুধিয়ার চোখের সামনে সমুদ্র, আকাশ, বালিয়াড়ি, মাছমারির চর—সমস্তই এক নিমিষে ডুবে গেল।

পদ্মবুড়ি নেই ?

কে তাকে আর রূপকথার গল্প বলে শোনাবে ? কে তাকে ছড়া কেটে, গান গেয়ে শোনাবে আর ?

কতোদিন সে পদ্মবুড়িকে দেখে নি।

যেদিন সে বাঁশিটাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল, সেই দিন চরের ওপর পদ্মবুড়ির সঙ্গে হয়েছিল তার শেষ দেখা।

পদ্মবুড়ি সেদিন তাকে তার একটি প্রিয় গল্পের শেষটুকু শোনাতে চেয়েছিল। সে শোনে নি। সেদিন সে শুনতে চায় নি গল্পের শেষ।

আর কোনদিন সে পদ্মবুড়ির মুখে গল্পটার শেষটুকু শুনতে পাবে না। তার মনে পড়ে, পদ্মবুড়ি তাকে সেদিন 'পাখি' 'পাখি' বলে ডাকতে ডাকতে অনেকদূর পর্যন্ত এসেছিল।

না, সে ফিরে যায় নি।

পদ্মবুড়ি আর তাকে কোনদিন 'পাখি' বলে ডাকবে না।

বুধিয়ার চোখটা জ্বালা করে আসে।

মংলা বলেঃ কিরে? দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে? চল্—

বুধিয়া চলতে থাকে।

পদ্মবুড়ির জন্যে মাছমারি গাঁয়ের অনেকেই কেঁদেছিল। সেই সঙ্গে আরও দুজন কেঁদেছিল, যদিও তাদের চোখের জল কেউ দেখতে পায় নি।

সে ময়না বউ আর বুধিয়া।

কে আর ময়না বউকে নতুন নতুন গান শোনাবে?

বুধিয়া মংলার পেছন পেছন চলতে থাকে।

বিকেলের রোদ্দুর ঈষৎ হলুদ হয়ে আসছে।

এরপর আরো রং বদ্‌লাবে। পশ্চিম আকাশে উপ্‌চে পড়বে রং। মেঘের ফালিগুলো সেই রঙে স্নান করে ভেসে যাবে। বালির চর, সমুদ্র আর আকাশ রঙের বন্যায় ফেটে পড়বে। দীর্ঘশ্বাসের মতো একটু বাতাস সমুদ্রের বুক তোলপাড় করে উঠে আসবে। তারপর চরের বালির বুক ভিজিয়ে দিয়ে মাছমারি গাঁয়ের বুকের ভেতর দিয়ে বয়ে যাবে।

....রাজ-পুত্তুর আর মন্ত্রী-পুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। মাঠের শেষে আছে এক ছায়াতরু। তাতে থাকে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী।....

মাছমারি গাঁয়ের লোকদের ওসব গল্প আর কেউ কখনো শোনাবে না।

পদ্মবুড়ির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাছমারি গাঁয়ের একটা যুগের অবসান হলো। শেষ হলো প্রাচীন সংস্কার, রূপকথা ও ছড়ার যুগ। এরপর হয়তো সিনেমা আসবে, মাইক্রোফোনের গান বাজবে মাছমারি গাঁয়ের

পথে পথে। পদ্মবুড়ির গলা আর শোনা যাবে না। পুরোনো কালের রূপকথা আর ছড়ার গানগুলি ধীরে ধীরে লোকের মন থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে।

এ যেন পদ্মবুড়ির মৃত্যু নয়, একটা যুগের মৃত্যু। যে যুগ নানা সংস্কার, নানা কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ও সুরের রসে সমৃদ্ধ, সেই প্রাচীন যুগের মৃত্যু হলো আজ।

মাছমারি গাঁয়ের আত্মার মৃত্যু হলো যেন।

মাছিমারি গাঁয়ের আত্মা আজ চরের বালির ওপর শুয়ে আছে।

আর গাঁয়ের সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শেষ দেখাটি দেখবার জন্যে।

বুধিয়া একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

পদ্মবুড়ি বালির ওপর শুয়ে আছে। চোখ দুটি বোজা। কিন্তু ঠোঁটে একটা হাসির রেখা নিবিড়ভাবে লেগে আছে। যেন এইমাত্র সে একটা গল্প শেষ করে গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গল্পের শেষ কথাটুকু এখনো বুঝি ঠোঁট থেকে মুছে যায় নি।

যে গল্প সেদিন পদ্মবুড়ি বুধিয়ার কাছে বলে শেষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি, আজ তা শেষ করে পরম নিশ্চিন্তভাবে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পদ্মবুড়ি কোনদিন কোন গল্পের শেষ করতো না। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে সে তার খন্‌খনে গলায় বলতো: বাকিটা আর একদিন শুনিস্—

পদ্মবুড়ি আজ তার সব গল্পের শেষ করে দিয়ে চলে গেল।

কদিন থেকে পদ্মবুড়ির জ্বর হচ্ছিল। কাকেও সে তার জ্বরের কথা বলেনি।

একদিন ঘনাই মণ্ডলের বউ জানতে পেরেছিল, গায়ে তার ছেঁড়া কম্বল দেখে। পদ্মবুড়ি বলেছিল: ও কিছু নয় রে। একটু শীত

করে। আমার কি আর তোদের মতন রক্ত গরম রয়েচে। আমাকে একটু জল দে দি'নি বউ—

সেই জ্বর গায়ে পদ্মবুড়ি সমুদ্রের চরে চরে ঝিনুক কুড়োতো।

উঠোনের এক কোণে সে একগাদা ঝিনুক জড়ো করেছিল।

বলতো ঃ শীত পড়লে এ গুলো পুড়িয়ে চুন তিয়ারি করবো। চুন বেচে ঘরের চালে দু' আঁটি খড় গুঁজে দিব। বিষ্টিতে ঘরে ঢেউ খেলে—

শীত পড়বার আগেই পদ্মবুড়ি চলে গেল।

ঘরে আর খড় দিতে হবে না তার। সে আকাশের নিচেই মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। আজও সে জ্বর গায়ে ঝিনুক কুড়োতে বেরিয়েছিল। মাথার ওপরে আশ্বিনের সূর্য আর পায়ের তলায় গরম বালি—সে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে নি। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সে।

ঠিক প্রণামের ভঙ্গিতে।

মাছমারি গ্রামকে প্রণাম জানিয়ে সে যেন কোন দূর তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করছে।

ঘনাই মোড়লের বউ তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে অনেক ডাকাডাকি করেছে। সাড়া না পেয়ে আঁজলা করে সমুদ্রের জল এনে তার মাথায় দিয়েছে। কোন ফল না পেয়ে গাঁয়ে খবর দিয়েছে। গাঁয়ের সবাই এসে তাকে সোজা করে শুইয়ে দিল।

এখন পদ্মবুড়ি গল্পের শেষ লাইনটির মতো পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে।

তারপর কি হবে ?

রাজপুত্তুর কি তেপান্তরের মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসবে না ? কাঠকুড়োনী সেই মেয়েটা কি ডাগর চোখে শুধু আকাশের কালো মেঘের দিকে চেয়ে দিন গুনবে ? রাজা শান্তনু মৎস্যগন্ধাকে বিয়ে করে কি ঘরে ফিরবেন না ?

গল্প বলো পদ্মবুড়ি, গল্প বলো—

এখনি তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

গল্প না বলো, না-ই বলো। সেই গানটা শোনাও তো পদ্মবুড়ি। সেই যে সেদিন আমাকে তুমি শোনাতে চেয়েছিলে—

তোর লেগে ঘর ছাড়লাম, সুখ ছাড়লাম
ছাড়লাম মুখের হাসি,
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু
হৈলেন পরবাসীরে, বন্ধুরে—

বুধিয়া দুহাতে মুখটা চেপে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

কাঠ আনা হলো, সাজানো হলো, পদ্মবুড়িকে শোয়ানো হল তার ওপর।

পদ্মবুড়ির স্বপ্ন-শয্যা।

বুধিয়া চোখের জলের ভেতর দিয়ে দূর থেকে চেয়ে দেখে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর তার চারদিকে মাছমারি গাঁয়ের সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে করুণ বিষণ্ণ মুখে।

এরপর তারা মাছমারি গাঁয়ের যত সংস্কার, যত রূপকথার প্রাণ-মাতানো গল্প, যত মন-কেমন-করা ছড়ার গান—সব পুড়িয়ে দিয়ে মুখ নিচু করে যে যার ঘরে ফিরে যাবে।

চরের বালির ওপর কালকের জন্যে কিছু ছাই পড়ে থাকবে মাত্র।

পরের দিন আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামলো।

সমুদ্রের বুকও তোলপাড় করে উঠেছিল।

পদ্মবুড়ির সব স্মৃতি মাছমারি গ্রাম থেকে, মাছমারি গাঁয়ের চরের ওপর থেকে নিঃশেষে মুছে গেল।

এরপর আর পদ্মবুড়ির কথা কারুর মনে পড়বে না।

শুধু যখন পশ্চিম আকাশ রঙের হোলি খেলায় মেতে উঠবে, দূরে

শীর্ণ নারকেল গাছগুলো আকাশের বুকে ঠেস্ দিয়ে অসীম ক্লান্তিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, পাখিরা সারি বেঁধে গাঁয়ে ফিরে আসবে আর পলাশবনের বুকে চিরে একটা পাখি আর্তনাদ করে কেঁদে উঠবে, তখন আর কারো নয়, শুধু বুধিয়ার বুকের ভেতরটাকে ভিজিয়ে দিয়ে একটা বাতাস হুহু করে বয়ে যাবে।

বৃষ্টিতে কটা দিন বড়ো করুণ হয়ে উঠেছিল।

নাকি ও মাছমারি গাঁয়ের চোখের জল?

ক দিন বাদেই রোদ উঠলো।

আকাশেও মেঘের স্মৃতি সব মুছে গেল। ময়না বউ বুধিয়াকে বলে: আর আমি কুনোদিন পদ্মবুড়ির গান গাইতে পারবো নি—

বুধিয়ার চোখ দুটো কদিনে খুব ছোট হয়ে গেছে। চোখের পাতাগুলো বড়ো বেশি ফুলে উঠলে বুঝি এই রকম হয়। সে জিজ্ঞেস করে: ক্যানে?

: ওর গান গাইতে গেলে যে ওর মুখটা বড়ো বেশি মনে পড়ে যায় রে—

ময়না বউর গলাটা একটু ভারি হয়ে আসে।

: ও যতো গান দিয়েছিল, যাবার সময় ও সব গান ফিরিয়ে লিয়ে গেচে।

বুধিয়া ভাবে, পদ্মবুড়িকে সবাই ভুলে গেলেও ময়না বউ ভুলতে পারে নি। বোধহয় কোনদিন সে ভুলতেও পারবে না।

সমুদ্র থেকে বুলান যখন ফিরলো না, তখন পদ্মবুড়িই ময়না বউর মনটাকে গল্প আর গানের রসে ভরে দিয়েছিল। বুলানের ব্যথা তখন ময়না বউ যে নিঃশব্দে সহ্য করতে পেরেছিল, সে ঐ পদ্মবুড়ির গল্প আর গানের শক্তিতে।

তার রূপকথার নানা গল্প, ছড়ার নানা গান তার মনে-প্রাণে একটা আশ্চর্য শক্তি এনে দিয়েছিল। সেই শক্তির জোরেই সে বুলানের

শোক নীরবে সহ্য করতে পেরেছিল। কান্নার মেঘ সরিয়ে তার মুখে হাসির রোদ্দুর ফুটিয়েছিল পদ্মবুড়ি।

সেই পদ্মবুড়িকে ময়না বউ কি জীবনেও ভুলতে পারবে?

বুধিয়াও পারবে না।

ময়না বউর সঙ্গে এইখানে বুধিয়ার মিল।

ছোটবেলা থেকেই বুধিয়া তার মাকে হারিয়েছিল। মায়ের মুখ তার মনে পড়ে না।

তার দশ বছর বয়সের সময় তাদের ঘরে এলো ময়না বউ।

মনে পড়ে, ময়না বউ বুধিয়ার সঙ্গে প্রথম দিন দুয়েক কথা বলে নি। বুধিয়াও দূরে দূরে পালিয়ে থেকেছে। তিন দিনের দিন ময়না বউ বুধিয়ার করুণ মিষ্টি মুখখানা দেখে তাকে বুকে চেপে ধরেছিল। বলেছিল: তোর বড়ো দুক্খু, লয় রে?

বুধিয়া মাথা দুলিয়ে তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো তুলে বলে: না তো—

: হুঁ, তোকে দেখলেই তাই মনে হয়—

একটু থেমে ময়না বউ জিজ্ঞেস করেছিল: ক্যানে রে?

বুধিয়া কোন কথা বলে নি। ময়না বউর কাছ থেকে সে পালিয়ে যেতেই চাইছিল।

: তোর একটা বউ হলে দুক্খু যাবে তো?

: ধেৎ—

: আঃ, লজ্জা পাচ্চিস্ ক্যানে? আমি না হয় তোরও বউ হবো—

সেদিন এক দৌড়ে বুধিয়া পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যখনই বুধিয়া সমুদ্রে যেতে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তখনই ময়না বউ বলেছে: কি রে? আমাকে খাওয়াবি পরাবি না তুই?

বুধিয়া এখন বুঝতে শিখেছে, বুলান নেই এবং ময়না বউকে খাওয়ানো, পরানো তাদের কর্তব্য।

সে তাই ময়না বউকে বলে : তোকে সে কথা ভাবতে হবে নি ?
: তেমন ভরসাই বা কুথায় ?
: তোর খাওয়ার, পরার অভাব হবে নি রে বউ।

বালিয়াড়ির ওপর থেকে পলাশ বনের মাথা ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক পদ্মবুড়ির একটা গানের মতো।

ময়না বউ বুধিয়াকে জিজ্ঞেস করে : তুই আজকাল বড়ো ভালো হয়ে গেচিস রে—

: ক্যানে ?

: আজকাল তুই বাঁশি বাজাস্ না, সমুদ্দুরে যেতে মুখ বেঁকাস্ না—

: অ—

বুধিয়া একটু ভেবে নেয়। বলে : বাঁশি আর বাজাবো নি বউ—

: ক্যানে রে ? যাত্রার দলে চাকরি—?

: করবো নি—

: ক্যানে রে ?

: জেলের ছেলে, মাছ ধরবো, মাছ বেচবো, খাবো।

একটু থেমে সে বলে : তোকে খাওয়াতে, পরাতে হবে নি ?

ময়না বউ হেসে ওঠে : অ-মা। তাই তুই বাঁশি বাজাবি নি ?

বুধিয়া গম্ভীর হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ময়না বউ মুখটা ভার করে বলে : না বাপু, বাঁশি বাজাবি তুই। বাঁশি না বাজালে তোকে দেখে ভারি কষ্ট হয়।

বুধিয়ার মুখটা ছল ছল করে ওঠে।

: কি রে, অমন হয়ে গেলি ক্যানে ?

: না। কিছু লয়।

একটু থেমে ময়না বউ জিজ্ঞেস করে : কাল আমাদের ডিঙি ভাসানো হবে, লয় ?

ঃ কাল লয়, পরশু—

ঃ খটিতে কবে যাবি রে ?

বুধিয়া হিসেব করে বলে ঃ সাত দিন বাকি।

শেষে মংলার সেই প্রতীক্ষিত দিন এলো।

তার ডিঙি, যার মালিক সে নিজেই, তা আজ জলে ভাসানো হবে। কাল রাতে তার চোখে সেই আনন্দে ঘুমই আসে নি।

এবার সে একখানা ডিঙির মালিক।

মাছমারি গাঁয়ের কোন জেলের নিজের ডিঙি নেই। সব ডিঙিই গোকুল গায়েনের। সবগুলোই ভাঙা নড়বড়ে। সারিয়ে দেয় না। তার ডিঙিটাও সে সারিয়ে দেয় নি।

তাকে পুরোনো ডিঙির বদলে নতুন ডিঙি দিতে বলেছিল মংলা। মিনতি করেই বলেছিল। কিন্তু গোকুল তার কথা শোনে নি। কথায় কথায় তাকে বিদ্রূপ করেছে, অপমান করেছে।

আজ গোকুল এসে তার নতুন ডিঙিখানা দেখে যাক্। সে ডিঙি দেয় নি—বয়ে গেছে। নিজেই টাকা খরচ করে সে একখানা কেমন মজবুত ডিঙি বানিয়ে নিয়েছে। গোক্‌লা আজ এসে তা নিজের চোখেই দেখে যাক।

শালা শয়তান !

সেদিন কথায় কথায় তার বাপ তুলে তাকে গালি দিয়েছিল। মংলা নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়েছিল, তাই বেঁচে গেছে সে। তা নইলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যেত সেদিন।

কিন্তু মংলার বড়ো দুঃখ রয়ে গেল, সে তার ডিঙিখানা গোকুল গায়েনকে দেখাতে পারলো না। পারলে জোঁকের মুখে ঠিক নুন পড়তো। গোকুল বোধহয় ভাবতেই পারেনি যে, মংলা ডিঙি বানিয়ে নিতে পারে। শুধু গোক্‌লা কেন ? মাছমারি গাঁয়ের কেউ কি ভাবতে পেরেছিল ? এমন কি, রাঘব, ময়না বউ, বুধিয়া—ওরাও কেউ ভাবতে পারে নি।

সে নিজেও কোনদিন ভাবতে পেরেছিল কি ?

সে নিজেই যা কোনদিন ভাবতে পারে নি আজ তার তাই হলো। নিজের একখানা ডিঙি হলো তার।

কিন্তু সোহাগী না হলে কি তা হতে পারতো ?

সোহাগীর জন্যেই সে এখন ডিঙির মালিক হতে পেরেছে। সোহাগীর কথা সে জীবনেও ভুলতে পারবে না।

আজ যে মাছমারি গাঁয়ের সবাই তার দিকে একটা সম্ভ্রমের চোখে তাকাচ্ছে, তাতে তার নিজের কৃতিত্ব কতটুকু ? গোকুল গায়েনের বাড়ি থেকে সে বড়ো ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এসেছিল। দাঁড়াবার জন্যে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছিল না সে। কি করে তার সংসার চলবে—এই ভাবনায় সে বড়ো হতাশ হয়ে সোহাগীর কাছে গিয়েছিল। সোহাগী তাকে দাঁড়াবার মাটি দিল, মনে শক্তি দিল আর মাছমারি গাঁয়ে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এনে দিল।

সে সোহাগীকে ভুলবে কেমন করে ?

কিন্তু তার জন্যে, তার সংসারের জন্যে সোহাগী কি করেছে, তা সে কারো কাছে বলতে পারবে না। কেউ জানবে না সোহাগী তার জন্যে কি করেছে। যা তার কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়, সেই গয়নাগুলি তার হাতে হাসিমুখে তুলে দিয়ে মংলার মনকে চিরদিনের মতো বিচলিত করে দিয়েছে।

না, সে কোনদিনও সোহাগীর কাছে তার ঋণের কথা ভুলতে পারবে না।

আজ তার ডিঙি প্রথম জলে ভাসবে।

সবাই দেখবে। কারো মন আনন্দে নেচে উঠবে, কারো মন জ্বলে উঠবে ঈর্ষায়।

কিন্তু যে দেখলে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেত, সে-ই শুধু উপস্থিত থাকতে পারবে না। সে-ই শুধু পাবে না আজকের আনন্দের ভাগ।

ডিঙি যখন জলে ভাসবে সে তখন একটা বনের উপকূলে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকবে, জানতেও পারবে না, তার ভালোবাসার দান আজ ডিঙি হয়ে সমুদ্রের জলে কেমন আনন্দে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

সোহাগীর জন্মে মংলার মনটা ভারি হয়ে ওঠে।

আজ তার ডিঙির প্রথম জলে ভাসার দৃশ্য সোহাগী দেখতে পারলো না।

কোন্ ভোর থেকে ডিঙি ভাসানোর আয়োজন চলেছে।

ডিঙিটার গলুইর মাথায় সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়েছে। ধুনোর গন্ধ আর ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করলো মংলা। তার গন্ধে মাছমারির চরটা ভরে উঠেছে। গাঁয়ের বহু লোক ভিড় করেছে ডিঙিটার চারপাশে।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে রাঘব আর ময়না বউ।

মংলা আর বুধিয়া জাল-বাঁশ, জলের কলসী, ভাতের হাঁড়ি ডিঙির ওপর রাখলো।

তারপর ঢেউএর প্রতীক্ষা।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়—

ঢেউ আসছে।

মংলা সূর্যকে, আকাশকে, সমুদ্রকে আর তার ডিঙিটাকে হাত জোড় করে প্রণাম করে।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়—

মংলা আর বুধিয়া ডিঙিটাকে ঢেউএর মুখে তুলে দেয়। গতি পেয়ে ডিঙিটা ঢেউএর পর ঢেউ ডিঙিয়ে এগিয়ে চলে।

ময়না বউ দুচোখ বন্ধ করে দুহাত কপালে ঠেকায়। রাঘব বিড় বিড় করে কি বলতে থাকে।

মাছমারি গাঁয়ের অন্যান্য ডিঙিগুলো ঢেউএর ওপর গা দুলিয়ে ভেসে ওঠে।

পুরোনো ভাঙা ডিঙিটা নিতান্ত অসহায় করুণ রূপে চরের বালির ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাকে।

মংলার ধমক-খাওয়া গোকুল গায়েনের বিষণ্ণ মুখের মতো।

বিকেলে রাঘব, মংলা, বুধিয়া—তিনজনেই দাওয়ায় বসে জালগুলো সারাতে থাকে।

তিন দিন বাদেই তারা মাদারমণির খটিতে যাবে। জালগুলো সারানো না হলে মাছ বেরিয়ে যাবে সব, এত আয়োজন সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। দাওয়ার খুঁটিতে জালগুলোকে বেঁধে নিয়েছে তারা। তারপর নিজের মনে সারিয়ে চলেছে কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলো।

কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই ব্যস্ত।

ময়না বউ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মংলার দিকে সে চেয়ে থাকে। মংলাকে আজ তার বড়ো প্রয়োজন। সে যেন কিছু বলতে চায় মংলাকে। মংলার চোখ দুটো জালের ওপব। সে দরজার দিকে না তাকালে ময়না বউ কিছুতেই তাকে ডাকতে পারছে না।

আজকাল ময়না বউর একটা বড়ো অসুবিধে হয়েছে।

তার মনটা জানাজানি হয়ে যাবার পর সে আর আগেকার মতো সবার সামনে মংলাকে ডাকতে পারে না। তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। কেমন যেন ভ:র বাধো-বাধো ঠেকে আজকাল। জিভ্‌টা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে যায় তার। দুনিয়ার যতো লজ্জা তখনই তাকে পেয়ে বসে। বিশেষ করে যখন রাঘব থাকে।

রাঘবের সামনে সে মংলাকে কিছুতেই ডাকতে পারে না আজকাল।

আজ তার মংলাকে বিশেষ প্রয়োজন।

যতো প্রয়োজনই থাক, সে চেঁচিয়ে কিছুতেই মংলাকে ডাকতে পারে না। সে মংলার মুখের দি:কে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। উঠোনে নারকেল গাছের ছায়াগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে কাঁপতে থাকে।

জট-পাকানো রহস্যের মতো জালগুলো এখানে ওখানে স্তূপাকারে পড়ে আছে।

কখন মংলা এদিকে তাকাবে?

সে কতোক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? মুরগীগুলো কি ভেবে ডাকহাঁক করে উঠলো।

মংলা মুখ তুলে তাকায়।

ময়না বউ হাত আর চোখের ইশারায় তাকে ডেকে ঘরের ভেতরে হারিয়ে যায়।

মংলা গোটা-দুই গেরো ফিরিয়ে সূতোটা দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে একবার আড়চোখে রাঘবের দিকে তাকিয়ে নেয়। তারপর উঠে চলে আসে।

রাঘবের কোঁচকানো চোখের পাতাগুলো রাগে বিরক্তিতে আরও কুঁচকিয়ে যায়।

মংলা ময়না বউকে একটু দূর থেকে জিজ্ঞেস করে: ডাকলি ক্যানে?

: ডাকবো নি ক্যানে?

ময়না বউ কাছে এগিয়ে আসে।

মংলা ময়না বউর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ নামায়। চোখে তার আজ জ্বালা ধরেছে যেন।

ময়না বউ বলে: আজকাল তোর কি হয়েচে বল্ দি নি?

: কিছু হয় নি তো—

: সব সময় দূরে দূরে থাকিস্। কাছে ডাকলেও আসতে চাস্ না—

: এই তো এয়েচি।

: মিছে কথা বলিস্ নি।

: কি বলতে চাস্, বল দি' নি।

: আজ তুই কুথাও যেতে পারবি নি। আমার কাছে থাকতে হবে তোকে।

: জাল সারাতে হবে নি?

ঃ না। ওরা সারিয়ে লিবে—

ঃ বেশ।

ঃ দাঁড়া। আমি আস্‌চি—

ময়না বউ ঘরের ভেতর থেকে একবাটি হাঁড়িয়া নিয়ে বেরিয়ে আসে।

ঃ লে, খা—

বাটিটা হাতে নিয়ে মংলা ময়না বউর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আজ ময়না বউর মনে কি আছে, কে জানে ?

ঃ খা। হাতে লিয়ে দাঁড়িয়ে র'লি ক্যানে ?

মংলা বাটিতে চুমুক দেয়।

ঃ সবটা খাস্‌ নি। আমার লেগে একটু রাখিস্‌—

বাটিটা প্রায় খালি করে মংলা ময়না বউর হাতে ফিরিয়ে দেয়। ময়না বউ কয়েকটা চুমুক দিয়ে মাটিতে বাটিটা নামিয়ে রাখলো।

ঃ চল্‌, ধান ভেনে দিবি চল্‌—

ঃ কিন্তুক—

ঃ কিন্তুক কি ?

ঃ দুয়ে না হৈলে ধান ভানবো কেমন করি ?

ঃ দুয়েই ভানবো, চল্‌—

হেসে ময়না বউ মংলার হাত ধরে টান দেয়।

দুজনেই ঢেঁকিতে পাড় দেয়।

ঢেঁকি ওঠে, ঢেঁকি পড়ে। ধান গুঁড়িয়ে যায়। শব্দ হয় বেধড়-দুম্‌, বেধড়-দুম্‌। শব্দ হয় বুকের ভেতর। দুটি দেহ তালে তালে দুলতে থাকে, নাচতে থাকে।

আশ্বিন মাসের বিকেলের রোদ্দুরে মিষ্টি রং লেগেছে। একটা আশ্চর্য খুশির আমেজ রোদ্দুরের ক[illegible]য় কানায় ছড়িয়ে পড়েছে। খুশির আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে রোদ্দুর।

ময়না বউর চোখে নেশার ঘোর লাগে।

মংলার কোমরে সাপের মতো একটা হাত জড়িয়ে দিয়ে ময়না বউ বলে ঃ আর কতোদিন এভাবে থাকবো রে ?

মংলার গলাটা জড়িয়ে আসছে। গলাটা সাফ করে নিয়ে সে বলে ঃ খটি থেকে ফিরে এলেই একটা বেবস্থা হয়ে যাবে।

ঃ সে তো অনেক দিন বাকি।

ঃ তিনমাস—

ঃ তি-ন-মা-স! তিনমাস কি কম ?

ঃ দেখতে দেখতেই কেটে যাবে—

বুধিয়া কি একটা কাজে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল। ঢেঁকিশালের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়ে ফিরে চলে যায়।

মংলা আর ময়না বউ কেউ জানতে পারলো না।

মংলা বলে ঃ বারো বচ্ছর থাকতে পারলি, আর তিন মাস থাকতে পারবি নি ?

ময়না বউর কাছে এখন একটা দিনও অসহ্য। বারো বছরের বাধা আজ তার সামনে থেকে সরে গেছে। তার মনটাকে শাসন করবার এখন আর কোন উপায় নেই। সে মাঝে মাঝে তাই কেমন যেন হয়ে যায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝে মাঝে সে সবাইকে লুকিয়ে হাঁড়িয়া খায়। বুকটা তোলপাড় করে ফেটে যাবার মত হয় এক-এক সময়।

চাল পাছ্ড়াতে পাছ্ড়াতে ময়না বউ বলে ঃ তিন মাস তোকে দেখতে পাবো নি। কেমন করে কাটবে, বল্ তো।

ময়না বউর গলাটা ব্যথায় যেন পাখির মতো ককিয়ে উঠলো।

শিরশিরে উত্তুরে বাতাস এরই মধ্যে বইতে আরম্ভ করেছে। বড়ো মিষ্টি হাওয়া। গায়ে একটা ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে চলে যায়।

আবার মাছমারি চরের ওপর পূজোর আয়োজন হয়েছে। ধুনোর

গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। মাছমারি গাঁয়ের বারো-চৌদ্দখানা ডিঙির পূজো হচ্ছে আজ। সেই সঙ্গে জাল, বাঁশ, দড়ি-দড়া—সব কিছুরই পূজো। সব শেষে হবে সমুদ্র-বন্দনা, গঙ্গার পূজো।

ঃ গঙ্গা মাই কী জয়—

মাছমারি গ্রাম আজ চরের ওপর ভেঙে পড়েছে যেন।

মাছমারি গ্রাম আজ খটিতে যাবে।

মাদারমনির খটিতে। সেখানে সুরু হবে মাছের আড়ৎ। দিন রাত ধরে চলবে শুধু মাছধরার পালা। আশ্বিন থেকে পৌষ। মাছমারি গাঁয়ের এই ক মাস কাটে মাদারমনিতে। পৌষ-সংক্রান্তির আগেই ফিরবে তারা।

আশ্বিন শেষ হতে আর দু দিনমাত্র বাকি।

এই তিনমাস মাছমারির চর কোন ডিঙির মুখ দেখবেনা!

পুব আকাশে সূর্য আলো ভাঙবে, সকালের কোঠা ছাড়িয়ে মাথার ওপর উঠে আসবে, তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়বে। কিন্তু মাছমারির চরের ওপর মানুষের ভিড় জমবে না। সকালেও না, দুপুরেও না। করুণ বিষণ্ন মুখে চরটা পড়ে পড়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে, বুক ফাটিয়ে কাঁদবে শুধু ঢেউএর কান্না।

বছরের এই তিনমাস মাছমারি গাঁয়ের পরবাস।

সবাই এসেছে।

ডিঙিগুলোতে জাল, বাঁশ, দড়ি-দড়া, হাঁড়ি-কলসী, চাল-ডাল, জ্বালানি—সব ভরে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কাঁথা মাদুর বালিশও নেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড শীতের কামড় সহ্য করে ওদের মাদারমনিতে মাছ ধরতে হবে। তার জন্যে যার যেটুকু সাধ্য, প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। ডিঙির মাঝখানে বাঁশের মাস্তুল। আজ তাতে পাল তুলে দিয়ে যাত্রা করবে ওরা।

সময় বড় বেশি নেই।

কিন্তু মংলা এখনো আসে নি। মংলা এখনো আসছে না কেন? ময়না বউও তো আসে নি।

রাঘব বারে বারে তাকায়।

মংলা ডিঙিটাতে জিনিষপত্র সব ঠিকমতো গুছিয়ে রেখে আবার ঘরে এসেছে। ময়না বউ তাকে বলেছিল ঃ ডিঙিতে জিনিষপত্তর রেখে ঘরে আসিস্ একবার।

মংলা ময়না বউর কথা রেখেছিল।

ঃ রাত্তিরে তোর আর তেষ্টা পায় না, নারে?

ময়না বউ জিজ্ঞেস করে।

মংলা কোন কথা না বলে চেয়ে থাকে।

ঃ ভেবেছিলাম, কাল রাত্তিরে তোর তেষ্টা পাবে।

ময়না বউর দৃষ্টি ভূমি-নিবদ্ধ।

ঃ কাল রাত্তিরে জল খেতে উঠলে ফিরাবো নি ঠিক করেছিলাম।

মংলা হেসে বলে ঃ তাই নি কি?

ময়না বউ বলে ঃ এখন আমার তেষ্টা ভীষণ বেড়ে গেচে রে। রাত্তিরে ঘুমই আসে না একদম।

ঃ কি করিস্ তা'লে?

ঃ খালি খালি দরজায় কান পেতে থাকি আর ঘটি ঘটি জল খাই—

বালিয়াড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে রাঘব ডাকছে মংলাকে ঃ মংলা, অ মংলা—আ—

ডাক শুনে মংলা চঞ্চল হয়ে যায়। তাকে এখন তাহলে চলে যেতে হবে।

ময়না বউর দু চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

ময়না বউ দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়।

হাত দুটিতে শাঁখা নেই। কবে ভাঙা হয়ে গেছে। কিছু নেই তার দুহাতে। হাত দুটিকে বড়ো করুণ, অসহায় লাগে মংলার।

নিরাশ্রয় হাত দুটি যেন আশ্রয় খুঁজে তার দিকে এগিয়ে এসেছে। যেন দুটো নীড়-হারা পাখি।

হাত দুটো দুহাতে ধরে থাকে মংলা।

আর সঙ্গে সঙ্গে ময়না বউ একটা ঢেউএর মতো তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মংলার বুকের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে ফেলে।

: তিনমাস তোকে দেখতে পাবো নি। আমার দিন কেমন করে কাটবে, বলে যা—

বালিয়াড়ির ওপর থেকে রাঘবের গলা শোনা যায়।

: মংলা, অ মংলা—আ—

ছি ছি, সবাই কি ভাবছে ? মংলা ময়না বউকে ছেড়ে আসতে পারছে না—সবার কাছে বোধহয় কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। রাঘবের ডাকের মধ্যে যেন তারি একটা ইংগিত রয়েছে।

মংলা বেরিয়ে যায়। আর ময়না বউ চোখ মুছে বেরিয়ে আসে তার পেছনে পেছনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়না বউ চরের ওপর মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

: গঙ্গা মাই কী জয়—

মাছমারির চরের ওপর থেকে বার-চৌদ্দখানা ডিঙি সমুদ্রের বুকে সাদা ডানা মেলে দিয়ে একদল হাঁসের মতো ভেসে চলে। পালে হাওয়া লেগেছে। চোখের আড়ালে চলে যেতে তাদের বেশি সময় লাগে না।

নদী নয়, অনেকটা নদীর মতো। নদীর মোহানা যেন।

কতো কাল থেকে তাতে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, কেউ জানে না। জোয়ার ভাঁটার টানে আপনা থেকেই একটা খাত তৈরী হয়ে গেছে।

স্থানীয় লোকেরা বলে 'বাদা'। এই 'বাদা'র সুরু 'ভ্যাড়া বাঁধে'র

গা থেকেই। ওখানে একটা লক্-গেট্ওয়ালা পোল। এই লক্-গেট্ দিয়ে দূর-দুরান্তের ভেড়ির জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মেশে। নানা খালে, নানা সূত্রে বিশ পঁচিশটা ভেড়ির জল এসে লক্-গেট্টার সাম্‌নে জমে। তারপর লক্-গেটের ভেতর দিয়ে 'বাদা'য় গিয়ে পড়ে। 'বাদা' যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে, তার নাম মাদারমনি।

নদী নয়, তবু মাদারমনি মোহানা।

কার্তিক মাসের সুরুতেই ভেড়িগুলোর ধান বেরুতে আরম্ভ করে। গোড়ায় জল জমে থাকলে ধান পাকতে অযথা দেরি হবে। তাই ভেড়িগুলোর জল বের করে দিতে হয়। লক্-গেট্ খোলা থাকে এই সময়। 'বাদা' দিয়ে জল ছুটে চলে। ভেড়ির মিঠে জল মাদারমনিতে নোনা জলের সঙ্গে গিয়ে মেশে। আর সমুদ্রের মাছ তা টের পেয়ে খেলতে বেরিয়ে পড়ে দল বেঁধে।

জেলেরা ডিঙি নিয়ে জাল পাতে। রাশি রাশি মাছ তোলে ডিঙিতে। মাঝে মাঝে মাদারমনির চরের ওপর মাছগুলো ঢেলে ডিঙিগুলোকে খালি করে ফিরে যেতে হয় মাঝ-দরিয়ায়।

তখন বেপারিরা ভিড় করে দাঁড়ায়। দর হাঁকাহাঁকি চলে। সোরগোল পড়ে যায় মাদারমনির চরের ওপর।

অনেক দূরের বেপারিরা মাছ নিতে আসে। কেউ আসে ঝাঁকা মাথায়, কেউ আসে সিকে-বাঁক নিয়ে। মাছ নিয়ে তারা গ্রামে গ্রামে কিংবা গ্রামান্তের হাটে হাটে চলে যায়।

আর আসে লরি। দূরে ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ভারে ভারে মাছ গিয়ে লরিতে ওঠে। লরি ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে শহর আর ইস্টিশানের পথে।

লরিতে থাকে বরফ। তাতে অক্ষত অবস্থায় মাছ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। আজকাল আবার 'ভ্যাড়া বাঁধের' কোল ঘেঁষে যে রাস্তাটা এসেছে, তাতে অনেকদূর পর্যন্ত জীপ চলে আসে। 'ভ্যাড়া বাঁধটা' ডিঙোতে পারে না তাই; নইলে মাদারমনি পর্যন্ত চলে আসতো।

বেপারিরা মাছ নিয়ে চলে গেলেও কোন কোনদিন আরো মাছ পড়ে থাকে। হাড়ি, বাগ্‌দি, কপালিরা বাড়তি মাছগুলো বালির ওপর শুকিয়ে নিয়ে শুঁট্‌কি করে। সময় মতো শুঁট্‌কি মাছের খদ্দেরও আসে। তারা শুঁট্‌কি মাছ কিনে নিয়ে পথে পথে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে যায়।

শুধু ডাঙাপথেই নয়, জলপথেও মাছ চালান যায়। নৌকোয় করে বেপারিরা মাছ নিয়ে যায়, নিয়ে যায় শুঁট্‌কি মাছও। কিন্তু নৌকোয় করে মাছ বেশিদূর যেতে না যেতেই পচে যায় বলে আজকাল আবার মোটর লঞ্চ এসেছে। মোটর লঞ্চে করে মাছ অনেকদূর পর্যন্ত যেতে পারে। বরফ চাপিয়ে কলকাতা পর্যন্তও নাকি চলে যায় আজকাল।

মাদারমনিতে শুধু মাছমারি গাঁয়েরই জেলেরা আসে না। অন্যান্য অনেক গ্রামের জেলেরাও আসে—অনেক, অনেক দূর থেকে। দল বেঁধে মাছ ধরে, থাকেও তারা দল বেঁধে। গাঁয়ের নামেই তাদের পরিচয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে রেশারেশিও থাকে। সেই রেশারেশি একদিন মারামারিতে পরিণত হয়। ফলে পুলিশ আসে, জেল হাজত হয়। তাছাড়া আরো নানা ব্যাপারে ও নানা আনুষঙ্গিক কারণে পুলিশকে মাদারমনিতে আসতে হয়।

সারা বছর মাদারমনি নির্জন বালির প্রান্তরে কাঁদে। কিন্তু কার্তিক থেকে পৌষ—এই তিন মাস বহু মানুষের ভিড়ে মাদারমনি সরগরম হয়ে থাকে।

সারি সারি হোগলার বেড়া দেওয়া অস্থায়ী ঘর তৈরী হয়ে যায়। ওপরেও হোগলার চালা। তারি মধ্যে হ্যাজাক্ জ্বলে, পেট্রোম্যাক্স জ্বলে, নাচগান চলে, যাত্রাগান হয়, তাড়ি হাঁড়িয়ার দোকান গুলো রাতের মধ্যে উজাড় হয়ে যায়। কোথাও বা জুয়ার আড্ডা বসে, কোথাও বা চলে নারী দেহের লাভ-জনক বেসাতি।

বছরে ক'মাস মাদারমনি একটা ছোট-খাটো শহর হয়ে ওঠে। এর বাতাসে শুধু মাছের গন্ধই নয়, টাকাও উড়তে থাকে। তার

আনুষঙ্গিক যত কিছু শহুরে পাপ, প্রতারণা ও দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। শহুরে পাপ এমনি করে নানা ব্যাধি আর অভ্যেসের ভেতর দিয়ে কতো অপাপবিদ্ধ গ্রামে প্রবাহিত হয়ে যায়। দরিদ্র জেলেরা হঠাৎ অনেক টাকা হাতে পেয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। অতি সহজে পাপের স্রোতে ভেসে যায়।

মাদারমনি জেলেদের কাছে একই সঙ্গে স্বর্গ ও নরক।

মংলা আর বুধিয়া মাছমারির অন্যান্য জেলেদের সঙ্গে ডিঙি নিয়ে চলে যায়। জাল পাতে, মাছ তোলে। তারই ফাঁকে মংলার মনে ভেসে ওঠে একটি মিষ্টি-মধুর মুখ।

সে মুখ সোহাগীর।

কতোদিন সোহাগীর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। সোহাগীর মুখের হাসি কতোদিন সে দেখে নি। সেই-যে সন্ধের অন্ধকারে গয়নাগুলো নিয়ে সে এসেছে, তারপর মহিষাজোড়ে সে একবার গিয়েছিল।

আর যায় নি।

সোহাগীর সঙ্গে তার আর দেখাও হয় নি। ইচ্ছে করেই সে দেখা করে নি। অথচ আসবার সময় সোহাগী তার হাত দুটো ধরে বলেছিল ঃ যাবার আগে আর একবার আসিস্—

সেও যাবে বলে কথা দিয়ে এসেছিল। কিন্তু কথা রাখতে সে পারে নি। নানা কাজের চাপে সে মহিষাজোড় গিয়েও সোহাগীর কাছে যাবার সময় করে উঠতে পারলো না। এদিকে মাদারমনিতে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো।

তাকে মাদারমনি চলে আসতে হলো।

সোহাগীর সঙ্গে দেখা করে আসা তার আর হয়ে উঠলো না।

সত্যি, সোহাগী কি ভাবছে তার সম্বন্ধে ?

তার গয়না বন্ধক দিয়ে মংলার ডিঙি হলো। কিন্তু সেই ডিঙি

মংলা সোহাগীকে দেখাতে পারে নি। সোহাগী দেখলে না জানি কতো খুশিই হতো।

ডিঙি না হয় না-ই দেখলো সোহাগী। পরে মাছমারির চরে কখনো এলে সে হয়তো দেখে যাবে ডিঙিটা। কিন্তু তখন ওটা পুরোনো হয়ে যাবে। নতুন ডিঙি তো আর সোহাগী দেখতে পেল না।

কিন্তু মংলা পরের বারে কেন সোহাগীর সঙ্গে দেখা করলো না? শুধু কি কাজের চাপ? কাজের চাপ অবশ্য ছিল। কিন্তু চেষ্টা করলে কি সে কাজের ভিড়ের ভেতর থেকে একটা বিকেলকে চুরি করে নিয়ে মহিষাজোড়ে যেতে পারতো না?

তা হয়তো সে পারতো। কিন্তু চেষ্টা করে নি।

কেন করে নি?

ইতিমধ্যে একটা স্বাভাবিক সংকোচ, একটা দ্বিধা তাকে মনে মনে বড়ো দুর্বল করে ফেলেছে।

সোহাগী জানে না যে সে তাকে গয়নাগুলো দিয়ে তার মহিষাজোড়ে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। দায়ে পড়ে মংলা গয়নাগুলো নিয়েছে বটে, কিন্তু মনে মনে সে খুশি হতে পারে নি। তার পৌরুষ একটি মেয়ে মানুষের কৃপার কাছে হেরে গেছে। এই বেদনা সে কেমন করে ভুলবে?

আগে যখন সে মহিষাজোড়ে গেছে তখন তাতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু এখন গয়নাগুলো যেন একটা বিরাট পাহাড় হয়ে তার যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

মাদারমনি থেকে সে টাকা নিয়ে ফিরবে। গয়নাগুলো ছাড়িয়ে এনে সোহাগীর হাতে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে মনে কোন শান্তি পাবে না। সে পর্যন্ত তার মহিষাজোড়ে যাওয়া হয়ে উঠবে না।

যত দিন যাচ্ছে, তার সংকোচ ততই বেড়ে যাচ্ছে।

কবে সে সোহাগীর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে? কতো-দিনে সে সোহাগীর মুখের হাসির রেখা দেখবে?

সোহাগীর কথা ভাবতে গিয়ে মংলা ডিঙি নিয়ে সবার পেছনে পড়ে গিয়েছিল। সামনের ডিঙিগুলোর ছোকরা জেলেরা ততক্ষণে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে : এই যে মাসি, অ মাসি, ও পিছনে আস্‌চে—

একজন জিজ্ঞেস করেঃ অ মাসি, তোর হাতে ওটা কি? পুঁটলিতে—?

মৈনিমাসি যা মুখে আসে, তাই বলে তাদের কথার জবাব দেয়।

মৈনিমাসিও আর মাছমারির চরে যায় না। অন্যান্য বেপারিদের সাথে সে এখন সোজা মাদারমনিতে চলে আসে। রোজ সে এখান থেকেই মাছ নিয়ে যায়।

আজকাল সে শুধু মংলার কাছ থেকেই মাছ নেয়। তাতে মাছমারির জেলেরাও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। সেই সঙ্গে তারা রঙ্গ-রসিকতার একটা খোরাকও পেয়ে গেছে।

আজ মৈনিমাসি মংলার কানের কাছে মুখ এনে বলে : লতুন চালের পিঠে। সুহাগী বানিয়ে পাঠিয়েছে। খাস্, বুঝলি? এঁ্যা?

মংলার হাতে পুঁটলিটা দিয়ে সে বলেঃ ঘরে পিঠে হয়েছিল। খেতে বসে তোর মুখটা খালি মনে পড়তে লাগল। সুহাগীকে বললাম, একা খেতে ভালো লাগছে নি রে। ওটার লেগে দুটো পিঠে বেঁধে দে, লিয়ে যাই। লতুন চালের পিঠে। খেতে ভালো লাগবে ওর। সুহাগী বেঁধে দিল। খাস্, বুঝলি?

: খাবো।

মৈনিমাসি মংলার ডিঙির পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়ায়। কোন্ মাছগুলো নেবে, সে বলে দেয় শুধু। মংলা তার ঝাঁকায় মাছ ভরে দিলে মৈনিমাসি বলেঃ কত দিব রে?

: তোর যা ইচ্ছে—

ঃ এই লে—

কয়েকটা টাকা মংলার হাতে গুঁজে দিয়ে মৈনিমাসি জিজ্ঞেস করে : শরীল ভালো যাচ্ছে তো? কিরে? মুখটা শুকিয়ে গেছে ক্যানে?

ঃ শরীল ভালো আছে, মাসি।

ঃ কি জানি বাপু, তোকে কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো লাগ্‌ছে।

মংলা হাসতে থাকে।

ঃ ঝাঁকাটা তুলে দে—

মৈনিমাসি ঝাঁকা মাথায় একটু দাঁড়ায়।

জিজ্ঞেস করে ঃ অঘ্রাণ শেষ হলে পৌষেই তো তোরা ফিরবি, লয় ?

ঃ পৌষের শেষে। এখনো তো অঘ্রাণের কদিন বাকি—

ঃ ফিরলে যাবি তো ?

মংলা হেসে বলে ঃ যাবো।

ঃ তা'লে খেজুরের গুড় দিয়ে নিজের হাতে পিঠে বানিয়ে তোকে খাওয়াবো—

পাশের ডিঙি থেকে একটা ছোক্‌রা জিজ্ঞেস করে ঃ অ মাসি, এতক্ষণ ধরে কি কথা বলচিস্ রে ? অ মাসি—

আরেকটা ডিঙি থেকে এক ছোক্‌রা বলে ওঠে ঃ তোর আজকাল কি হয়েচে রে মাসি ?

পাশের ডিঙি থেকেই সুর করে ছড়া কেটে তার জবাব আসে ঃ মাসি—মংলার গলায় দিল ফাঁসি—

ঃ এ্যায় !

মংলা ধমক দিয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চুপ করে যায়।

মাছ নিয়ে মৈনিমাসি চলে যায়।

মংলা অন্যান্য বেপারিদের মাছ দিয়ে হিসেব করে টাকা নিয়ে কোমরের গেঁজেতে রাখলো। ডিঙিটাকে দু ভাইতে বালির ওপর তুলে দিয়ে তাদের হোগ্‌লায় ছাওয়া ঘরটায় ফিরে যায়।

আজ আর ভাত রাঁধতে হবে না। দু ভাই সোহাগীর হাতের তৈরী পিঠে খেয়ে একটু জিরিয়ে বিকেলে ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে যাবে।

পুঁটলি থেকে পিঠে বের করে কলসী থেকে ঘটিতে জল নিয়ে দু ভাই খেল। বালির ওপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়লো দু জনে।

মংলা শুয়ে শুয়ে ভাবে সোহাগীর কথা, মৈনিমাসির কথা।

সোহাগী তাকে তাহলে ভোলে নি। তার কথা ভেবে পিঠে বানিয়েছে সোহাগী, পুঁটলিতে করে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে।

অথচ সে সোহাগীকে কি দিতে পেরেছে? কিছুই না।

কিন্তু সোহাগীর কাছ থেকে সে পেয়েছে অনেক। যার কোন তুলনাই হয় না। কোন্ মেয়ে পারে তার সব গয়না অন্যের হাতে তুলে দিতে?

শুধু তাই নয়।

দরদ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে পিঠে বানিয়ে এই প্রবাসে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর ভেতর দিয়ে সে যেন বলতে চায়ঃ আমি তোমায় ভুলি নি। মুখের কথায় বিশ্বাস না হয়, কাজে দেখো। কিন্তু তুমি তো ভুলেছ। মন থেকে সোহাগীর কথা মুছে ফেলেছ। যদি মনে থাকতো, তাহলে তুমি যাবার আগে আর একবার এখানে আসতে।

সত্যি, মংলা একবার যাবার আগে সোহাগীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতো।

গয়না দিয়ে সোহাগী মংলার উপকারে লেগে তাকে কাছে পেতে চেয়েছিল। তাকে হারাতে সে চায় নি। কিন্তু মংলা ভাবে, সোহাগী তাকে কেন গয়না দিল? গয়না দিয়ে সোহাগী তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সে যে আর আগের মতো তার সামনে গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হবে, সোহাগী তাকে দয়া করেছে। সোহাগীর দয়া কুড়িয়ে সে বড়ো হয়েছে।

সে তা তো চায় নি।

সোহাগীর গয়নাগুলো ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

আর ক'টা দিন মাত্র বাকি। মাসখানেক হবে।

এখনি সোহাগীর গয়না খোলসা করে আনার মতো টাকা তার হাতে এসে গেছে। একবার মনে মনে হিসেব করে দেখলো সে। বরং কিছু বেশিই এসেছে। এখন মাসখানেক একটু বেশি করে খাটতে হবে। এই মাসের রোজকারই হবে তার সারা বছরের সম্বল।

ভাবতে ভাবতে মংলা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙলো যখন, তখন ছায়া অনেকখানি হেলে পড়েছে। বুধিয়া অনেক আগেই উঠে বসে আছে।

মংলা বুধিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ডিঙিতে যাবার জন্যে।

ডিঙিতে যেতে যেতে সে শুনতে পায়, কারা যেন বলছে ঃ ভাড়া-করা যাত্রার দল এসেছে।

আজ রাতেই গান হবে। মেয়েরা করবে মেয়েদের পার্ট। কেউ কেউ তাদের দেখে ফেলেছে ইতিমধ্যে। এক একটা যেন ডানাকাটা পরী। ইস্, কি রূপ!

এতদিন ছোকরারাই মেয়ে সাজতো। এবারে মেয়ে সাজবে মেয়েরাই। এ একেবারে নতুন।

সবাই যাত্রাগান শোনার জন্যে সন্ধে নামতে না নামতেই ফিরে এলো। মংলার একটু দেরি হয়ে গেল ফিরতে।

প্রথমে সে ভাবলো, তার যাত্রাগান শুনলে হবে না। একটু বেশি করে খাটতে হবে। ঋণ শোধ করে সারা বছরের সংসার চালাবার খরচ তাকে রোজগার করতেই হবে।

তার কি যাত্রাগান শুনলে চলে?

কিন্তু সবাই ফিরে চলে যেতে তারও মনটা কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়লো।

না, সেও আজ রাতে যাত্রাগান শুনবে। সকাল-সকাল যা পারে দুটো খেয়ে নিয়ে মংলা যাত্রাগান শুনতে বেরিয়ে পড়ে। বুধিয়াকে জিজ্ঞেস্ করে ঃ তুই যাবি নি?

ঃ না।

বুধিয়া যাত্রাগান শুনবে না। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। দিনের মতো আলো করে হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্স্ জ্বলছে। মাঝখানে আসর। চারদিকে লোকেরা ভিড় করে বসেছে। তাড়ি আর হাঁড়িয়ার গন্ধে বাতাসও বুঝি মাতাল হয়ে উঠেছে। মংলা একপাশে গিয়ে বসলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সিন্ বেজে উঠলো।

তারপর যাত্রাগান সুরু হয়ে গেল।

রামায়ণের গল্প। রাম-লক্ষ্মণের বনবাস, সীতার হরণ, রাবণ বধ, সীতার উদ্ধার—এই হচ্ছে আজকের পালার মূল কথা।

মংলা বসে মন দিয়ে দেখছে। দুচোখে সব কিছু যেন গিলছে সে আজ? সে আজ এই প্রথম যাত্রা দেখছে। সব কিছুই তার কাছে যেন সত্য। যেন অতীতের কোন ঘটনা নয়, আজকেই সব তার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে একের পর এক।

সব চেয়ে চমৎকার হয়েছিল সীতার হরণ দৃশ্যটি।

সীতার অনুরোধে রাম গেছে সোনার হরিণ ধরে আনতে। তারপর বিপন্ন রামের চিৎকার শোনা গেল ঃ লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ যেতে চায়নি। সীতার তিরস্কারে সে সীতার চারপাশে একটা দাগ টেনে দিয়ে ছুটে যায়। তারপর একটা ভিখিরির বেশে এলো রাবণ। মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো তার ভয়ানক চেহারা। চকিতের মধ্যে সে সীতার হাতখানা তার শক্ত মুঠোর ভেতর পুরে নিল। সীতা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। সে কতো ডাকলো রামের নাম ধরে। কারো কোন সাড়া নেই। টেনে হেঁচ্ড়াতে হেঁচ্ড়াতে রাবণ নিয়ে গেল সীতাকে। সীতা চোখের জলে গাছপালা, পশুপাখিকে সাক্ষী রেখে গেল। এমন সময় এগিয়ে এলো জটায়ু নামে একটা পাখি। মংলার প্রাণেও একটু ভরসা এলো। কিন্তু রাবণ তলোয়ার দিয়ে তার ডানা দুটো কেটে দিয়ে সীতাকে নিয়ে চলে গেল।

মংলার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়।

সীতাকে দেখে তার চোখের সামনে সোহাগীর চেহারা মনে ভেসে ওঠে। আর রাবণকে তার মনে হয় গোকুল গায়েন বলে। সে যদি একবার রাবণকে কাছে পেত, তাহলে দুহাতে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বালিতে পুঁতে ফেলতো।

কেউ জানতে পারতো না।

এর পর সীতা মনের দুঃখে রাবণের ঘরে থাকবে। না কি গোকুল গায়েন মৈনিমাসির কাছে যেমন ঝি-এর খোঁজ করেছিল, তেমনি ভাবে সীতা রাবণের ঘরে ঝি-এর কাজ করবে ?

সীতার দুঃখের কথা ভেবে সে বড়ো বিচলিত হয়ে ওঠে। রাবণের ঘরে সীতা কেমন রয়েছে, তা দেখার জন্যে মংলার মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

ধীরে ধীরে উঠে সে বেরিয়ে আসে!

নিঃশব্দে সাজঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সীতা তখন সেখানে কে-একটা লোকের সঙ্গে বসে কি যেন তামাসা করছে আর মনের আনন্দে পান চিবোচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত আগে তার যে একটা বিরাট্‌ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তা তাকে দেখে বোঝা যায় না। আর এত বড় দুর্ঘটনা যার ঘটে, সে কি এখন বসে তামাসা করে হাসতে পারে, না প্রাণ ভরে পান চিবোতে পারে ? মংলা তাজ্জব বনে যায়, যখন সীতা পাশের লোকটাকে বলছে ঃ তাড়িটা একটু বেশি হয়ে গেছে, একটু জর্দা দে মাইরি—

মংলা ভালো করে লোকটাকে চেয়ে দেখে।

সর্বনাশ! এই লোকটাই তো রাবণ সেজেছে।

সীতা রাবণের কাছ থেকে জর্দা নিয়ে খেল। তারপর পান চিবিয়ে বালির ওপর পিচ্‌ ফেলে সে বলে ঃ টাকা না পেলে কাল আমি নামবোই না। ম্যানেজারকে বলে দিস্‌, বুঝলি ?

রাবণ বলে : আমার কাছ থেকে এত টাকা নিলি, কি করলি সব? এ্যাঁ?

: কেন সে টাকা কি তুই মাগ্‌না দিয়েছিস্‌? উসুল করে তবে ছাড়িস্‌ নি?

রাবণ হাসতে থাকে।

সীতা বালির ওপর কয়েকবার পানের পিচ্‌ ফেলে বলে : মাথাটা যে টল্‌ছে রে। আরো যে আমার একটা সিন্‌ বাকি। অগ্নিপরীক্ষার সিন্‌—একটু জল আন তো দেখি—

রাবণের কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে সীতা চোখ বোজে।

মুখ ঘুরিয়ে রাবণ মংলাকে দেখতে পায়। অমনি খ্যাঁক্‌ করে ওঠে : এখানে দাঁড়িয়ে 'হাঁ' করে কি দেখছিস্‌, এ্যাঁ? অসভ্য—

মংলা ঠিকই ভেবেছে। রাবণ ঠিক গোক্‌লার মতোই নিচের পাটির দাঁতগুলো বের করে কথা বলে।

মংলা চলে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে সে রাবণের ডাক শুনতে পায় : এ্যায় লোকটা, শোন্‌ তো—একটু জল নিয়ে আয় তো দেখি।

সীতা জল খাবে। রাবণের ওপর রাগ করে কি মংলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? এক দৌড়ে সে তার হোগলার ঘরটাতে আসে। বুধিয়া তখন ঘুমোচ্ছে। ঘটিতে করে জল নিয়ে সে দৌড়ে যায়।

রাবণ সীতার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিল। কানের পাশে, ঘাড়ের ওপর হাত বুলিয়ে দিল। সীতা মুখে জল নিয়ে কুল্‌কুচো করে বালির ওপর ফেলে দেয়। চোখ মেলে সীতা মংলার দিকে তাকিয়ে বলে : তোর জলটা বড়ো ঠাণ্ডা মাইরি—

মংলা ঘটিটা নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। সীতা জিজ্ঞেস করে : কি জাত রে তুই?

মংলা সংকোচের সুরে বলে : জেলে—

ঃ ই-মা। জেলে তুই? আর তোর জল মুখে দিলাম। ভাগ্যিস্ খাই নি—

ঘটিটা হাতে নিয়ে মংলা আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না। ঘরে ফিরে গিয়ে ঘটিটা এক কোণে নামিয়ে রেখে সে বিছানাটা পেতে নেয়। তারপর একখানা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

যাত্রা দেখার উৎসাহ তার আর নেই।

কোন্ ভোরে মংলাদের ডিঙি মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে।

আজ মাছমারি গাঁয়ের অনেক ডিঙিই আসে নি। গতরাতের তাড়ি আর যাত্রার নেশার ঘোর অনেকের এখনো কাটে নি।

ডিঙিতে বসে মংলা কাল রাতের কথা ভাবে।

সীতাকে দেখে তার শুধু সোহাগীর কথাই মনে হচ্ছিল। রাবণ তাকে যখন চুরি করে নিয়ে যায়, তখন তার মনের ভেতর দুঃখ এবং ক্রোধ একই সঙ্গে ফেটে পড়ছিল।

....সাক্ষী থাকো তরুলতা, সাক্ষী থাকো পশু পাখি....

সীতার এই কথাগুলো এখনো তার কানে বাজছে আর তার বুকের ভেতরটা বার বার মোচড় খেয়ে উঠছে।

তার পরমুহূর্তে সে দেখলো, সীতা সাজঘরে বসে আর কারো সঙ্গে নয়, রাবণের সঙ্গেই বসে তামাসা করছে আর পান চিবিয়ে ঘন ঘন পিচ্ ফেলছে। সে তাড়ি খেয়েছে, রাবণের কাছে থেকে জর্দা চেয়ে খেয়েছে।

আরো কেন যেন রাবণের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

তাহলে আসরে এতক্ষণ সে যা দেখেছে, তা সব মিথ্যে? কোন্‌টা মিথ্যে, কোন্‌টা সত্যি—সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

মনে পড়ে, কাল সে সীতার জন্যে ঠাণ্ডা জল নিয়ে ছুটে গিয়েছিল। তার দেওয়া জল সে মুখে চোখে মাথায় দিয়েছে, কিন্তু খায় নি। তাতে

তার দুঃখ ছিল না। কিন্তু সে জেলে—ছোট জাত বলে সীতা তাকে যে অপমান করেছে, তাতে সে বড়ো বেশি দুঃখ পেয়েছে।

কাল সীতা তাকে বড়ো অপমান করেছে। তাকে এতো অপমান রাবণও করেনি।

গোকুল গায়েনও না।

মংলার বুকের ভেতরটা ধিকি ধিকি জ্বল্‌তে থাকে।

তাহলে কি সোহাগীও তাকে এমনি ঘৃণা করে? সুযোগ পেলে সেও হয়তো কোনদিন তাকে অপমান করে বসতে পারে। গয়না দিয়ে তাকে সে খাটো করেছে, অপমান দিয়ে হয়তো কোনদিন তাকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবে। বলা যায় না, কোনদিন সেও হয়তো গোকুল গায়েনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে, ঝি-এর কাজ নিয়ে থাকবে সে গোকুল গায়েনের বাড়ি—ঠিক যাত্রা দলের সীতার মতো।

মংলা আর ভাবতে পারে না। বুকের ভেতরটা তার জ্বলে যাচ্ছে।

ডিঙিতে মাছ নিয়ে ফিরতেই মৈনিমাসির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মৈনিমাসি জিজ্ঞেস করে: খেয়েছিলি তো?

মংলা কোন কথা না বলে মৈনিমাসির মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

: কিরে? কথা বল্‌ছিস্‌ নি যে?

মংলা লজ্জা পেয়ে যায়। মৈনিমাসির ঝাঁকায় মাছ তুলে দিয়ে টাকা নিল সে। কোনকথা না বলে মৈনিমাসির মাথায় ঝাঁকা তুলে দিয়ে অন্য বেপারিদের সাথে কথা বলে।

ঘরে ফিরে সে বুধিয়াকে উনুন ধরিয়ে ভাত চড়াতে বলে নিজে সিকে-বাঁক নিয়ে গেল জল আনতে।

এখানে সব জলই নোনা।

মাইল খানেক দূরে বালির মধ্যে একটা ডোবায় কিছু বৃষ্টির জল জমে থাকে। মিঠে জল। কিন্তু বালির নুন ধুয়ে তারও জল নোনা

হয়ে ওঠে। সমুদ্রের নিশ্বাস লাগলে মিঠে জলও নোনা হয়ে যায়। সেই ডোবার জল খেয়ে এসেছে তারা এতকাল।

গত বছর সরকার থেকে একটা নলকূপ এখানে বসিয়ে দিয়েছে। জলের অভাব তাই এখন একটু মিটেছে। আর দুপুরের রোদ্দুরে পুড়ে ওদের কষ্ট করে অত দূরে জল আনতে যেতে হয় না।

মংলা সিকে-বাঁক নিয়ে নলকূপের কাছে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। একী! নলকূপের মুখের নিচে ভিজে কাপড়ে যে বসে আছে, সে যে অন্য কেউ নয়—কাল রাতের সীতা।

ঃ ও-মা তুই? কাল রাতে তুই জল দিয়েছিলি, না?

মংলা কোন কথা না বলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সীতা ভিজে কাপড়ে নলকূপের মুখের কাছে বাঁধানো শানের ওপর বসে হাসতে থাকে।

ঃ দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? এ দিকে আয় না। ও, লজ্জা পাচ্ছিস? লজ্জা কি রে? আমি কি তোকে দেখে লজ্জা পাচ্ছি? ছাখ্, লজ্জা বলে কোন কথাই নেই।

মংলা জল না নিয়ে ফিরে যাবে নাকি ভাবে।

ঃ কলটা শিগ্‌গির টিপে দে দেখি, স্নান ক'রে নি'। সমুদ্রে স্নান করে গায়ে পুরু হয়ে নুন বসে গেছে। যা মাছের গন্ধ এখানে। বা-ব্বা—

মংলা এগিয়ে যায়। সিকে-বাঁক নামিয়ে রেখে নলকূপের হাতলটায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে।

ঃ কিরে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ঃ আমার ছোঁয়া জলে তোর শরীল নোংরা হয়ে যাবে নি তো?

সীতা তার মুখের দিকে চেয়ে ভুরু বাঁকিয়ে হেসে ওঠে।

ঃ না, নোংরা হবে নি। নে, দেখি শিগ্‌গির—

মংলা নলকূপের হাতলটা ধরে জোরে জোরে চাপ দেয়। আর সীতা বসে স্নান করতে থাকে।

ঃ আঃ, কী ঠাণ্ডা জল—

মংলা কোন কথা বলে না।

ঃ কাল তোর হাতের জল খাই নি বলে রাগ করেছিস, না? আচ্ছা, এই দেখ, তোর হাতের জল খাচ্ছি।

আঁজলায় করে জল খায় সীতা। বলেঃ দেখলি তো?

মংলার রাগ পড়ে যায়। একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করেঃ

ঃ তোর নাম কি রে?

ঃ কেন রে? প্রেমে পড়লি নাকি? এ্যাঁ?

মংলা বুঝতে পারে না। সীতা বলেঃ কঞ্চি, বুঝলি, আমার নাম কঞ্চি?

মংলা জিজ্ঞেস করেঃ তোর দেশ কুথায়?

ঃ দেশ?

কঞ্চি হি হি করে হেসে ওঠে। থেমে বলেঃ কোথাও না।

আবার সে হাসে। বলেঃ দেশ আমার কোথাও নেই, বুঝলি?

কঞ্চি থামলো।

একটু গম্ভীর হয়ে সে বলেঃ একদিন ছিল, এখন আর নেই।

হঠাৎ থেমে গেল সে। কি ভেবে সে বলেঃ নেহাৎ যদি জিজ্ঞেস করিস, তবে কলকাতা। আর বেশি যদি জানতে চাস্ তবে কলকাতা নয়, অনেক দূরে—

ঃ?

ঃ বরিশাল। শুনেছিস্? শুনিস্ নি তো? যাক্, বাঁচা গেল।

কঞ্চির স্নান হয়ে গিয়েছিল।

সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে ভিজে শাড়ির ওপর ভিজে গামছাটা ভাল করে জড়িয়ে নেয়। দূরে কাকে আসতে দেখে সে চেঁচিয়ে বলে ওঠেঃ দাঁড়াও, যাচ্ছি—

কোন কথা না বলে ভিজে কাপড়ে শব্দ আর ঢেউ তুলে কঞ্চি চলে যায়।

মংলা ফিরে তাকিয়ে দেখে, লোকটা আর কেউ নয়, কাল রাতের রাবণ।

জল নিয়ে ফিরে এলো মংলা। কিন্তু মনটা তার আবার খারাপ হয়ে গেছে।

ভাত খেয়ে জিরোলো।

বিকেলে ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে গেল, সন্ধের পর মাছ নিয়ে ফিরে এলো। মনে মনে ঠিক করে সে ফিরলো, আজ রাতে সে আর যাত্রা দেখবে না। কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোবে।

সে আর মন খারাপ করবে না।

চরে ফিরে এসে সে লক্ষ্য করলো, আজ আর বেপারিদের বিশেষ ভিড় নেই।

সন্ধের পর যারা মাছ নিতে আসে, আজ তাদের কারুর মুখই সে দেখতে পেল না। কেমন যেন একটা ভয় জড়ানো থম্‌থমে্ ভাব।

কি হলো? বেপারিদের ভিড় নেই কেন?

অনেক ভেবে চিন্তে মাছগুলো সস্তায় ছেড়ে দিল সে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে সে লক্ষ্য করলো, এখানে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। অনেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে অনেক ঘরের হোগলার ছাউনি নামিয়ে ফেলা হয়েছে। কেউ কেউ জিনিসপত্র ডিঙিতে তুলতে আরম্ভ করেছে। অন্ধকারে জায়গায় জায়গায় কারা সব জট্‌লা করছে। কেউ ফিরে যাবার কথা বলছে। কেউ বলছে: ভয় কি? দুদিন দেখি না?

মংলা কাছেই একটা চেনা মুখ দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে: কি হয়েচে রে?

: জানিস্ না?

: না

: সে কি রে? খটি আদ্দেক ভেঙে গেচে। তুই জানিস্ না?

ঃ না—

লোকটা ফিস্ ফিস্ করে বলে ঃ ওলান হয়েচে। একজন মরেচে। একজন জেলে—বালিতে পুঁতে দেওয়া হয়েচে।

মংলা বলে ঃ এতো লতুন লয়। ফি বছরই তো ওলান হয়। কিছু লোকও মারা যায়। পালাবার হয়েচেটা কি ?

ঃ কাল সরকারী ডাক্তার আসবে ছুঁচ ফুটাবে। হ্যাঁ—

কলেরার ভয়ের চেয়ে সরকারী ডাক্তারের ছুঁচের ভয়টা ওদের বেশি।

মংলা বলে ঃ তাতে হয়েচে কি ? ছুঁচ একটা ফুটাবে ছাড়া আর কিছু লয়—

লোকটার গলা ধীরে চড়তে থাকে ঃ হুঁ, খুব সাহস দেখানো হচ্চে। যখন হাতখানা ধরে ইয়া বড়ো একটা ছুঁচ—ওরে বাপ্—

লোকটা পালাবার জন্যে পা বাড়ায়। যেন তারই হাতে ছুঁচ ফুটানো হচ্ছে।

মংলা তার হাতখানা ধরে ফেলতেই সে ভয়ে প্রায় দৌড় দিতে যাচ্ছিল। যেন আর তার রক্ষে নেই।

ঃ শুন্, শুন্। যাত্রা গান হবে নি ?

ঃ যাত্রা গান ?

লোকটা যেন ক্ষেপে উঠলো।

ঃ যাত্রা গান হচ্চে ভালো করে। ওদের দলের দু তিন জনের ধরে গেচে।

ঃ তাই নি কি ?

চারিদিকে ভয়ের অন্ধকার থম্ থম্ করছে।

একটা গভীর আতঙ্কের কালো ডানা মেলে দিয়ে চার দিকে রাত জেগে বসে আছে। এখানে ওখানে অন্ধকার চাপ বেঁধেছে। জমাট-বাঁধা অন্ধকার এখানে ওখানে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন

ষড়যন্ত্র করছে। রাতটাও কি অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে গেছে আজ। যেন ভোর হতেই চায় না।

সকাল হলো।

মংলা চেয়ে দেখলো, খটি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে! রাতারাতি এত লোক পালালো কোথায়? যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। আর যারা রয়েছে তাদের ভয়ার্ত মুখ একেবারে বালির মতো ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে।

একপাশ দিয়ে সুড় সুড় করে যাত্রার দলের লোকেরা ট্রাঙ্ক, তোরঙ, বাক্স, সুটকেশ—কেউ বাঁকে, কেউ মাথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সকলের পেছনে চলেছে ম্যানেজার। মুখটা তার একেবারে ঝুলে পড়েছে। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে তার।

একটা কুলি মরেছে। আর একটা ধুঁকছে। একটা মেয়েকেও ধরেছে কাল রাতে।

তাদের ফেলে রেখে ম্যানেজার চলে যাচ্ছে।

যেতে তার পা উঠছে না যেন। কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে তাকায়।

যারা দাঁড়িয়েছিল, ম্যানেজার সেই দিকে চেয়ে তাদের ডাকে। বলে: ওরা রইলো, হয়ে গেলে ওদের সমুদ্রের জলে ফেলে দিও। কেমন? সর্বনাশ হয়ে গেল আমার, সর্বনাশ হয়ে গেল—

কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ম্যানেজার চলে যায়।

ম্যানেজারের সামনে কোন দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছে রাবণ। তার মুখেও ভয়।

ভয় মংলাও পেয়েছিল।

ভয় পেয়ে সে ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

চারিদিকে এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা।

সেই নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে সে এক মেয়ের আর্ত চিৎকার শুনতে পায়। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে কি যেন ভাবে। তারপর চিৎকারের দিকে এগিয়ে যায়।

তখনও চিৎকার চলেছে। গলাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

একটা ঘর থেকে আসছে চিৎকারটা।

একটু এগিয়ে গিয়ে সে ঘরের ভেতর উঁকি মেরে তাকালো।

একি!

এ যে কঞ্চি!

একটা মাদুরে পড়ে কঞ্চি ছট্‌ফট্‌ করছে আর কষ্টে চিৎকার করছে গলা ছেড়ে।

চোখ খুলে কঞ্চি মংলাকে চিনতে পারলো।

ঃ হ্যাঁ রে, ওরা সব চলে গেছে?

মংলা কি বলবে ঠিক করতে পারে না।

ঃ আমাকে ফেলে ওরা পালিয়েছে। পাছে ওদের কাউকে ধরে, তাই আমাকে নিয়ে গেল না।

কঞ্চির দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

ঃ আমি ঠিক মরে যাবো, না রে?

মংলা বলে ঃ মরবি ক্যানে? ভালোও হয়ে যেতে পারিস তো—

ঃ ভালো হবো, তুই বল্‌ছিস?

কঞ্চি কি ভাবলো। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো একটু।

ঃ একটু জল দিবি? একটু জল দে তো—

মংলা জল এনে দিল। কঞ্চি জল খেল।

ঃ সেদিন তোর হাতের জল খাই নি। আজ যদি বাঁচি, তোর হাতের জল খেয়েই বাঁচবো। তোর হাতটা একটু কপালে দে তো—

মংলার হাতটা কপালে চেপে ধরে কঞ্চি চুপচাপ পড়ে রইলো। দুচোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

ঃ যদি মরে যাই, তাহলে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিস্‌। বামুনের মেয়ে আমি। কাউকে ছুঁতে দিবি নি, বুঝলি?

মংলা দড়ি থেকে একখানা কাপড় নিয়ে আর একখানা মাদুরের

ওপর পেতে দিল। তার ওপর কঞ্চিকে শুইয়ে শুকনো কাপড় জড়িয়ে দিল ওর গায়ে।

তারপর নোংরা কাপড় আর মাদুর সমুদ্রের জলে ধুয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিয়ে সমুদ্রে স্নান করে ঘরে ফিরে এলো।

সূর্য সকালের আকাশে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

আর দেরি করা চলে না। যারা ডিঙি নিয়ে যাবার, সকলেই চলে গেছে। মংলাও এবার বুধিয়াকে নিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যায় মাঝ-সমুদ্রে।

মনটা তার আজ বড়োই খারাপ। আর ভয় ছিল না। কিন্তু একটি মাত্র চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছিল। কঞ্চি ভালো হয়ে উঠবে তো? মনে মনে ঠিক করলো, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে কঞ্চিকে বাঁচাবার জন্যে। তারপর যা থাকে কপালে।

কোন্ দূর দেশের মেয়ে সে। আর কোথায় এসে সে পড়ে মরছে। সঙ্গে কেউ নেই। যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা সবাই প্রাণের ভয়ে তাকে ফেলে রেখে পালিয়েছে। এখন কঞ্চি বড়ো অসহায়, বড়ো বিপন্ন।

তাকে বাঁচাতেই হবে।

ডিঙি নিয়ে ফিরতেই সে দেখলো, সরকারী ডাক্তারেরা এসে পড়েছে। বেপারিদের ধরে ধরে তারা তাদের হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। জেলেরা ডিঙি থেকে নামলেই তাদের ঘিরে ফেলছে। বেপারিরা কেউ ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, কেউ ছুঁচের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। জেলেরা ডিঙি থেকে ভয়ে নামতেই চাইছে না। ডাক্তারেরা চরের ওপর ছুঁচ তৈরী করে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মৈনিমাসি এতক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মংলার ডিঙি আসছে দেখে সে চরের ওপর এসে দাঁড়াতেই এক ডাক্তার তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো। ডাক্তারের হাতে ছুঁচ দেখতে

পেয়ে মৈনিমাসি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে : ওরে বাপ্ রে, মেরে ফেলেছে রে ; ওরে আমার বাপ্, ছেড়ে দে। অরে মংলা, আমাকে আবাগীর পো মেরে ফেলছে—

মংলা কি করবে ভেবে না পেয়ে ডিঙি থেকে নেমে আসে। ততক্ষণে মৈনিমাসির হাতে ছুঁচ ফুটানো হয়ে গেছে। মৈনিমাসি বালির ওপর বসে পড়ে ছুঁচ ফুটানো হাতের ওপর হাত বুলোচ্ছে আর ডাক্তারের পিতৃ-পুরুষদের উদ্ধার করছে।

মংলা চরের ওপর উঠে আসতেই এক ডাক্তার তার দিকে এগিয়ে আসে। সে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকায় একটু। তারপর ছুঁচ ফুটায়। মংলারও হাতে ব্যথা লেগেছে। সে সেদিকে মন না দিয়ে মৈনিমাসির দিকে এগিয়ে যায়। মৈনিমাসির হাতে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে সে বলে : মাছ লিতে হবে নি। তুই ঘরে ফিরে যা। এখন কদিন আসবি নি। বুঝলি ?

মৈনিমাসি উঠে দাঁড়ায়।

: তুইও চলে যা। এখানে থাকিস নি আর।

: যাবো—

মৈনিমাসি চলে যেতেই মংলা ছুটে কঞ্চির ঘরে গেল। কঞ্চি বেঁচে আছে তো ? ডাকলো : কঞ্চি—

কঞ্চি ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে তাকায়।

মংলা চরের দিকে ফিরে আসে। এক ডাক্তারকে বলে : এদিকে একটু আসতে আজ্ঞা হয় ডাক্তরবাবু।

: কেন ?

ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

: ছুঁচ লিবে ?

: কে ?

: ঘরের লোক।

ঃ অ—

ডাক্তারবাবুটি তার সঙ্গে আসে। কঞ্চির ঘরের ভেতরে একটু দাঁড়িয়ে সে বেরিয়ে আসে গম্ভীর মুখে।

ঃ কখন থেকে হয়েছে।

ঃ কাল রাত্তির থেকে—

ঃ হুঁ। এর লোকজন কই?

ঃ সব পালিয়েছে।

ডাক্তার একটু থেমে বলে ঃ টাকা খরচ করতে হবে। কে করবে?

মংলা বলে ঃ ক্যানে? আমি?

ডাক্তার এক ছোক্‌রা ডাক্তারকে কি বলে মংলাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। 'ভ্যাড়া বাঁধে'র ছায়ার আড়ালে ওদের সরকারী জীপ দাঁড়িয়েছিল। তা থেকে দুটো কি বড়ো বড়ো জলভরা শিশি, রবারের নল, ওষুধ, ছুঁচ মংলার হাতে দিয়ে ছোক্‌রা ডাক্তার পেছন পেছন আসে। মংলা হাতে ওসব নিয়ে ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াতেই ডাক্তার তার সঙ্গে চলে আসে। ছোকরা ডাক্তারও এলো। বড়ো মোটা শিশি দুটো টাঙানো হলো।

কঞ্চি ইশারা করে মংলাকে ডাকে। মংলার হাতে সুটকেশের চাবিটা দিয়ে চোখ বুজলো।

কঞ্চির সুটকেশ থেকে মংলা টাকা বের করে দিল ডাক্তারের হাতে।

যাবার সময় ডাক্তার বলে গেল ঃ কাল আবার এসে খবর নেব।

এদিকে সরকারী লোকেরা সব ডিঙি থেকে মাছ ঢেলে বালিতে পুঁতে দিয়ে গেল। ওতে নাকি কলেরা ছড়ায়। ব্লিচিং পাউডারের গন্ধে খটির বাতাস উগ্র হয়ে উঠলো।

মাদারমনি ধীরে ধীরে শান্ত হলো

মাঝে মাঝে এমনি হয়, মাদারমনি ক্ষেপে ওঠে। তাকে শান্ত করার জন্যে জেলেরা চাঁদা তোলে। মা শীতলার পূজো করে। প্রসাদ খায়।

কিন্তু সরকারী লোকেরা ও সব মানে না। তারা খবর পেয়ে জীপ নিয়ে ছুটে আসে। 'ইন্-অকুলেশান্' স্বুরু হয়ে যায়। ডোবায় ও নলকূপের কাছে কড়া পাহারা বসে।

মাদারমনি ধীরে ধীরে শান্ত হয়।

কিন্তু প্রতি বছরই মাদারমনিতে কয়েকজন মরে।

স্থানীয় সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর পূর্বাহ্নে সতর্কতার ব্যবস্থা করলেই তো পারে। কিন্তু তা করে না। ঘরে বাঘ না পড়লে কুম্ভকর্ণের ঘুম কোনদিন ভাঙেনি, ভাঙবেও না।

কঞ্চি ধীরে ধীরে সেরে উঠছে।

আর দুজন মাত্র মরেছে। যাত্রাদলের সেই কুলিটা, আর গাঁওখালির একজন জেলে। এ বছরের সর্ব মোট খতিয়ান্ তিন।

আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম স্বুরু হয়ে গেছে মাদারমনিতে। জেলেরা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। বেপারিরাও সময় মতো এসে ভিড় জমায় মাছ নেবার জন্যে। সরকারী লোকেরা ক্যাম্প্ তুলে নিয়ে ফিরে গেছে।

এখন মৈনিমাসিও আসে। মাছ নিয়ে যায়।

স্বাভাবিক ভাবে ব্যবসা চলে। কিন্তু এখন যেন ভাঙা হাট। জমছে না আর কিছুতেই।

তবে সাহস করে যে সব জেলে মাদারমনিতে থেকে গিয়েছিল, তারাই জিতলো। শেষের মাসটা তারা প্রচুর মাছ ধরেছে এবং একটু বেশি দামেই বিক্রী করেছে। জেলেরা সংখ্যায় কম হয়ে যাওয়ায় বাজার একটু গরম হয়ে উঠেছিল শেষের দিকটা।

মংলার মনটা ভারি খুশি।

সে এবারে অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশিই রোজগার করেছে। যা টাকা হাতে এসেছে, তাতে সোহাগীর গয়না খালাস করে এনে

আরও বেশ কিছু হাতে থেকে যাবে। তাতে কমপক্ষে তাদের সাত আট মাসের খোরাক্ হয়ে যাবে।

পৌষ সংক্রান্তিরও আর বেশি দেরি নেই।

এবার ফিরবার আয়োজন করতে হবে।

ভাবতে মংলার মনটা আনন্দে দুলে ওঠে।

তিন মাস পরে সে মাছমারি গাঁয়ে ফিরে যাবে। ময়না বউ তার জন্যে পথ চেয়ে আছে। তারা ফিরলেই মাঘ মাসেই তার সঙ্গে ময়না বউর বিয়ে হয়ে যাবে। অবশ্যি, তার আগে তাকে একবার মহিষাজোড় যেতে হবে।

সোহাগীর গয়নাগুলো ফেরৎ না দিয়ে সে মনে সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

কঞ্চি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে।

কঞ্চির অসুখের সময় মংলা তার সুটকেশে একটা ছবি দেখেছে। ছবিতে কঞ্চি একটা ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কঞ্চি ভালো হয়ে উঠলে, মংলা ভেবেছিল, তাকে জিজ্ঞেস করবে ছেলেটার কথা। ছেলেটা কে? তার সম্পর্কে মংলার কৌতুহল জমাট বেঁধে উঠেছে।

কঞ্চি তো এখন সেরে উঠেছে।

চরে হেঁটে বেড়াতে পারে।

এখন একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়। কিন্তু কেনই বা সে জিজ্ঞেস করবে? কি দরকার?

বিকেলে চরের ওপরেই তার সঙ্গে কঞ্চির দেখা হয়ে যায়। কঞ্চি বেড়িয়ে ফিরছিল। হাসি মুখে দূর থেকে মংলাকে কাছে ডাকে। মংলা তার সঙ্গে একটু হাঁটলো। অসুখে ভুগে কঞ্চির মুখটা বড়ো শুকিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ হেঁটেছে সে। তাই বোধ হয় সে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল। কঞ্চি বলে: একটু বসা যাক্, কি বল্।

দুজনে পাশাপাশি বসলো।

কারো মুখে কথা নেই। মংলা জিজ্ঞেস করে : এখন তোর কেমন লাগচে।

কঞ্চির ঠোঁটে এক টুক্‌রো হাসি ফুটে ওঠে। বলে : ভালো ?

মংলা একটু থামে। বলে—

: পরশুদিন সকালেই আমরা চলে যাবো, বুঝলি ?

: আমিও যাবো।

: কুথায় ?

: তোদের গাঁয়ে। কেন, নিয়ে যেতে পারবি না ? ও, বউ রাগ করবে বুঝি ?

মংলা একটু ভেবে নিয়ে বলে : তুই ফিরে যা—

কঞ্চি হেসে বলে : তাই যাবো রে। তোকে আর জ্বালাবো না। অনেক জ্বালিয়েছি, না ?

কঞ্চি একটু থামলো। তারপর বলে : সবাই আমাকে ফেলে পালালো। আর তুই আমাকে ঘিরে রাখলি। মরতেও দিলি না তুই। তোকে ছেড়ে যেতে যে আমার খুব কষ্ট হবে রে—

কঞ্চির গলাটা একটু কেঁপে উঠলো।

মংলার একটা দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে মিশে গেল।

: কুথায় যাবি তুই ?

: কলকাতায়।

: একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, বল্‌বি তো ?

: বল্ না—

: কার কাছে যাবি রে তুই ?

: কার কাছে ? তাইতো, বড়ো মুশ্‌কিলে ফেল্‌লি তুই। কার কাছে যাই, বল্ তো ?

: ক্যানে ? তোর সুটকেশে যার ছবি আছে, তার কাছে ?

: ছবিটা তুই দেখে ফেলেছিস্, যাঃ—

মংলা ছবিটাতে দেখেছে, ছেলেটার পাশে কঞ্চি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে

আছে। যেন একটা নৌকো নিরাপদ কূলে আশ্রয় পেয়েছে, এমনি ভাব।

কঞ্চি বলে : তার কাছে আমি যেতে পারবো না—

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো কঞ্চির।

: ক্যানে ?

কঞ্চি হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটু দম নিয়ে বলে : ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

সে একটু থামে। বলে : ওর সঙ্গেই আমার একদিন বিয়ে হয়েছিল, বুঝলি ? কদিন বাদে জানতে পারলাম, ওর আরো একটা বউ আছে।

: তারপর ?

: রিফিউজি মেয়ে বলে অতি সহজেই সে আমাকে বিয়ে করতে পেরেছিল, জানিস্ ? আমিও ভাবলাম, রিফিউজি মেয়ের কপাল এর চেয়ে আর কতো ভালো হবে ? তাই বিয়ের ছ'মাস পরে ও যখন ছেড়ে পালালো, তখন ওই এক কথাই ভাবলাম। দেশ ভেঙেছে, গাঁ ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে। এবার কপালও ভাঙলো, কি বল্ ?

কঞ্চি হাস্‌লো। সমুদ্রের দার্ঘশ্বাসের সঙ্গে সেই হাসি কান্নার মতো শোনালো।

পৃথিবীতে কতো রকমের মানুষ আছে, কতো রকমের দুঃখ। মংলার মনে হয়, শুধু মাছমারি আর মহিষজোড় এই দুখানা গ্রাম নিয়েই পৃথিবী নয়। পৃথিবীটা অনেক বড়।

একবার সে ভাবে, কঞ্চিকে ঘরে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে, রাঘব ময়না বউ তাকে কেউ তাহলে ক্ষমা করবে না। তারও জীবনে দুঃখ কিছু কম নয়। কঞ্চির দুঃখের ভার আর সে বইতে পারবে না।

কঞ্চি যেতে চায় ; যেখানে খুশি যায়, যাক।

এই বিরাট পৃথিবীতে সে তার স্থান খুঁজে নেবে।

পরের দিন বিকেলে একটা স্যুটকেশ হাতে নিয়ে কঞ্চি বেরিয়ে পড়লো। মংলা তার হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে বললোঃ চল্, তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

মংলা অনেক দূর চলে এসেছিল কঞ্চির সঙ্গে সঙ্গে। কঞ্চি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে স্যুটকেশটা কেড়ে নিয়ে বলেঃ এবার ফিরে যা। অনেক দূর চলে এসেছিস তুই।

মংলা জিজ্ঞেস করেঃ একা যেতে পারবি তো?

ঃ পারবো। বাসে উঠে পড়তে পারলে—

কঞ্চি দাঁড়িয়ে কি ভাবে। তারপর মংলার একটা হাত ধরে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেঃ আর দেখা হবে না তোর সাথে। কিন্তু তোকে আমি কি করে ভুলবো, বল তো? তোর ঋণ আমি জীবনেও—

মংলার বুকের ভেতরটা, কেন জানিনা, হূহু করে উঠলো। পশ্চিম আকাশের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে সে বলেঃ বেলা বেশি নেই। এবার তুই যা। কিন্তুক কুথায় যাবি রে, তুই?

কঞ্চি বলেঃ ঠিক জানি না।

কঞ্চি স্যুটকেশ হাতে চলে যায়।

মংলা দাঁড়িয়ে থাকে।

মংলার মনে পড়ে, যেতে যেতে কঞ্চি বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। চোখের জল মুছছিল আর হোঁচট খাচ্ছিল পায়ে পায়ে।

তারপর দূরে তার ছায়াটা হারিয়ে গেল নিঃশেষে।

আর তাকে কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ডিঙিতে পাল তুলে দিয়ে মংলা ফিরে চলেছে মাছমারি গাঁয়ে।

ডিঙিতে বসে মংলা নিজের মনে ভাবে, পৃথিবীটা কত বড়ো। সেখানে কত মানুষ। সেই বহু মানুষের ভিড়ে আজ কঞ্চি কোথায় হারিয়ে গেছে। আর কখনও তার দেখা পাওয়া যাবে না। সীতার

দেখা সে কখনো পাবে না। সীতা সত্যি সত্যি নির্বাসিত হলো আজ। কিন্তু কোথায়? কোন্ বনে?

মাদারমনির চর পিছনে কোথায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

মাছমারির চর চোখের সামনে ভেসে উঠতে আর কতো দেরি?

সেদিন যখন মংলার ডিঙি এসে মাছমারির চরে ভিড়লো, তখন সূর্য মাথার ওপর অনেকখানি হেলে পড়েছে। চরের ওপর কেউ ছিল না।

বুধিয়া ঘরে গিয়ে খবর দিলে সবাই জানতে পারলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাঘব এলো। তার পিছনে ময়না বউ।

ধরাধরি করে জিনিস পত্র নামানো হলো ডিঙি থেকে। মংলা, বুধিয়া আর ময়না বউ—তিন জনে ঘরে বয়ে নিয়ে গেল সব। রাঘব ডিঙির কাছে বালির ওপর বসে রইলো পা ছড়িয়ে।

সব শেষে সেও ফিরে এলো ঘরে।

বিকেল হলো।

বিকেলের একরাশ চঞ্চল রোদ্দুর বাইরের উঠোনে লুটিয়ে পড়েছে। নারকেল গাছের ছায়ার দ্বীপগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে সেই রোদ্দুরের সমুদ্রে। মুরগীগুলো বালি ঠুক্‌রে কি যেন খুঁজছে। সমুদ্র অবিশ্রাম ঢেউ ভাঙছে।

মংলা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে মনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। অনেকগুলো ঢেউ যেন ছুটে এসে বেলাভূমিকে তোলপাড় করে তুললো।

আজ কঞ্চিকে তার বড়ো বেশি মনে পড়ছে। কাল ঠিক এমনি সময় কঞ্চি চলে গেছে। যাবার সময় তার দু চোখের কূল ছাপিয়ে বন্যা নেমেছিল। আকণ্ঠ কান্না ঠেলে উঠেছিল তার।

: আর দেখা হবে না তোর সাথে। কিন্তু তোকে আমি কি করে ভুলবো, বলতো? তোর ঋণ আমি জীবনেও—

যাকে কোনদিন পাওয়া যাবে না, তাকেই আজ তার বেশি করে মনে পড়ে কেন? যে দৃষ্টির ওপারে চলে গেছে, তাকেই আজ খুঁজে তার মনটা বেদনায় এই বিকেলের মতো করুণ হয়ে উঠেছে। সে আজ লক্ষ লোকের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তার দেখা আর কোনদিন পাবে না সে।

মংলা উঠে পড়ে। না, সে আর কঞ্চির কথা ভাববে না।

ঘরের ভেতরে পা দিতেই তার চোখে পড়ে, ময়না বউ যে কাপড়টা পরেছে, ছুঁচ আর সূতো দিয়ে সেই কাপড়টাই মনোযোগ দিয়ে সেলাই করছে। বুকের ওপরের কাপড় কোলের ওপর পড়ে আছে তার। সেই কাপড়টাই নিজের মনে সেলাই করছে ময়না বউ।

মংলা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে শুধু ময়না বউর মসৃণ পিঠটাই চোখে পড়ে।

সত্যি, ময়না বউ বড়ো সুন্দর, কিন্তু বড়ো করুণ।

ভেতরের উঠোনে বিকেলের রোদ্দুর মুছে যাচ্ছে। ঠিক সেই মুছে-যাওয়া রোদ্দুরের মতো ময়না বউ মুখ নিচু করে বসে আছে।

মংলা কয়েক পা এগিয়ে যায়।

তার পায়ের শব্দ পেয়ে ময়নাবউ পেছন ফিরে তাকায় এবং চকিতের মধ্যে কাপড়টা টানাটানি করে বুকের ওপর তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে মুখ নিচু করে।

ঃ কি করছিলি রে বউ?

মংলা এসে সামনে দাঁড়ায়।

ঃ কিছু না।

মংলা লক্ষ্য করেছে, ময়না বউ এখনো পর্যন্ত তার সাথে কোন কথা বলে নি।

কি হয়েছে ময়না বউর?

এতদিন পরে সে মাদারমনি থেকে ফিরে এলো, কিন্তু ময়না বউ একটা কথাও বললো না তার সাথে। অথচ যেদিন মংলা

মাদারমনিতে যাচ্ছিল, সে দিন ময়না বউর মুখে কথা যেন শেষই হচ্ছিল না। ডিঙিতে যেতে তার দেরি হয়ে যাচ্ছিল সেদিন।

আর আজ, এই তিন মাস পরে সে মাদারমনি থেকে ফিরে এলো। এই তিন মাসে কি কোন কথাই জমে ওঠে নি ময়না বউর মনে?

মংলা আরও দু'পা এগিয়ে যায়। তার পাশে বসে পড়ে।

ঃ হ্যাঁ, কিছু যেন করছিলি তুই? কি করছিলি বল না?

ঃ কি করছিলাম? দেখতে পাস্ নি তুই?

ময়না বউর গলায় রাগের ঝাঁঝ মেশানো।

মংলা বুঝতে পেরেছে, কেন ময়না বউ রাগ করেছে। উঠে চলে যাচ্ছিল সে।

ময়না বউ বলে ঃ ছেঁড়া কাপড়ে রয়েচি। খটি থেকে ফিরলি আর আমার জন্যে তুই একখানা লতুন কাপড় লিয়ে আসতে পারলি নি। কতো টান বুঝা গেচে।

মংলা বসে পড়ে।

ঃ সত্যি, ভুল হয়ে গেচে বড়ো ভুল হয়ে গেচে। আমি তোর জন্যে কালই কাপড় এনে দিচ্চি একখানা। না, একখানা লয়, দু খানা—

ময়না বউ মুখ নিচু করে বসে থাকে। বলে ঃ তোর তো ভুল হয়ে যাবেই। আর আমার দিন যেন কাটতেই চায় নি।

মংলা কি বলবে, ভেবে পায় না। একটু থেমে সে বলে ঃ আমি ভেবেছিলাম, ঘরে ফিরলে একটা দিন ঠিক হয়ে যাবে। তারপর যা যা কিনবার একদিন গিয়ে সব কিনে লিয়ে আসবো।

মংলা চেয়ে দেখলো, এক ঝাঁক কাঠবিড়ালীর খুশির মতো বিকেলের উজ্জ্বল রোদ্দুর পুব দিকের চালের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠে যাচ্ছে। আর তার নিচে লজ্জার মতো গাঢ় ছায়া নিঃশব্দে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। যেন খুশিতে চঞ্চল দুটি চোখের দিকে ময়না বউর মুখের মিষ্টি অভিমান।

মুখে হাসি ফুটে ওঠে ময়না বউর।

ঃ শাঁখা আনবি নি ?

ঃ আনবো।

ঃ ময়নাবউ একটু থেমে বলে ঃ আর গয়না দিবি নি ?

মংলা কি ভেবে বলে ঃ দিব।

সেদিন সন্ধেয় ঘনাই মণ্ডলকে রাঘব ডেকে এনেছিল। দাওয়ায় বসে অনেক কথা হলো দু জনের। মংলা বসেছিল মাদুরে—একটু দূরে। সবই শুনলো সে।

রাঘব সম্মতি দিয়েছে।

শুধু সম্মতিই নয়, আয়োজনের খুঁটিনাটি নিয়ে উপদেশও ছিল সেই সঙ্গে। কতো দিনের মোড়ল সে। তার কাছে ঘনাই মণ্ডল তো একেবারে আনাড়ি। এ সব ব্যাপারে মাছমারি গাঁয়ে তার জুড়ি নেই।

মাঘ মাসের পনের তারিখ।

দিন ঠিক হয়ে গেল। মংলার বিয়ে।

গাঁয়ে সবই জানাজানি হয়ে গেল। সবার সামনে এখন একটা মাত্র দিন, পনেরই মাঘ। সেদিন মাছমারি গ্রাম এক উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবে। তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটি উৎসব।

পৌষ-সংক্রান্তিতে মাছমারির চরে মেলা বসে। তিন দিন বাদে সেই পৌষ-সংক্রান্তির মেলা।

বহু দূর দূরান্তর থেকে পুণ্যার্থীরা এসে ভিড় করে মাছমারির চরের ওপর। দোকানী-পসারীরা দোকান সাজিয়ে বসে। লোকেরা সমুদ্রে স্নান করে মনের আনন্দে। বছরের পাপ সমুদ্রের জলে ধুয়ে রেখে তারা যে যার ঘরে ফিরে যায়।

পৌষ সংক্রান্তির আর এক নাম মকর-সংক্রান্তি। পৌষ মাস সূর্যের মকর-ক্রান্তি পরিক্রমার শেষ মাস। এবার থেকে সূর্যের ফিরবার পালা। সূর্যের এই মকর-ক্রান্তি পরিক্রমার ফলেই তো এ অঞ্চলের

শীতকাল। শীতকাল জড়তা, বার্ধক্য ও মলিনতার ঋতু। মকর-সংক্রান্তির দিন দলে দলে লোক ছুটে আসে সমুদ্রের জলে শীতের সেই জড়তাকে ধুয়ে ফেলার জন্যে।

যুগের পর যুগ কেটে গেছে। মানুষের সেই প্রাচীন বিশ্বাস এখনো অমলিন!

যুগ যুগ ধরে মাছমারির চরের ওপর স্নানযাত্রার মেলা বসে আসছে। এ বছরও মেলা বসবে।

তিন দিন মাত্র বাকি।

পরের দিন দুপুরের একটু পরেই মংলা বেরিয়ে পড়লো।

প্রথমে টেকোপাত্রের দোকান। তারপর মহিষাজোড়ের পথ।

মাঠের ধান এখন উঠে গেছে। সে আজ মাঠের সোজা রাস্তাই ধরলো।

আজ প্রায় পাঁচ মাস পরে সোহাগীর সঙ্গে তার দেখা হবে। মনটা আনন্দে তাই নেচে ওঠে।

সোহাগীর সঙ্গে তার দেখা হবে আজ।

মংলা যখন গোকুল গায়েনের বাড়ি থেকে ভাঙা মন আর বুক-জোড়া হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছিল, তখনই সোহাগী তার গয়নাগুলো এগিয়ে দিয়ে তার সকল হতাশা মুছে দিয়েছিল। সোহাগীর গয়না ছাড়া মংলার ডিঙি হতো না, টাকাও হতো না—একথা মংলা ছাড়া আর কেউ জানবে না। কেউ না। সোহাগীর সাহায্য না পেলে ভেঙে পড়তো সমস্ত সংসারটা। সোহাগী চিরদিনের মতো ঋণের একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলেছে।

সে তা থেকে মুক্ত হবে কি করে?

আবার মাদারমনিতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেখানেও সোহাগী পাঠিয়ে দিয়েছে তার সোহাগের স্পর্শ। ভুলতে দেয় নি তাকে।

সোহাগীকে সে ভুলবে কি করে ?

শীতের বেলা। বড়ো ছোট।

মাঠ পেরোবার আগেই রোদ্দুরে বিকেলের রং লেগে গেল।

এবার বনের পথ। ছায়া-গভীর বনের সরু পথ দিয়ে যেতে যেতে মনটা তার হঠাৎ খুশিতে ভরে ওঠে। এখানে ওখানে বনের মাথায় পাখিদের কলকণ্ঠের কাকলি। কয়েকটা কাঠবিড়ালী তাকে দেখে ছুটে পালায়।

এই বনের পথেই একদিন সোহাগীকে সে নারকেল পাতা টানতে টানতে নিয়ে যেতে দেখেছিল। সে দিনের কথা সে কখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সেই সঙ্গে আরেকটা ঘটনাও তার মনে পড়ে যায়।

সেই ঝড়ের রাত, তখনও ভোর হতে দেরি আছে। সোহাগী তাকে এই বনের ভেতর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। একটা কিসের শব্দে ভয় পেয়ে সে তার ওপর এসে পড়েছিল। সেদিন এক দারুণ বিস্ফোরণে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল যেন। তারপর সে কী গভীর সমস্যা ! কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারছে না।

আজ আবার তার সোহাগীর সঙ্গে দেখা হবে।

সোহাগীকে সে তার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে ঋণমুক্ত হবে সে আজ। কিন্তু সোহাগীর ঋণ কি শুধতে পারবে সে কোনদিন ?

পারবে না, কখনো পারবে না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে, বিয়েতে সোহাগীকে আসতে বলতে হবে তো ! কিন্তু কি করে সে সোহাগীকে কথাটা বলবে ? কিংবা সে বলবে না একেবারে ? না বললেও একদিন তো সে জানতেই পারবে সব। কিন্তু তাই বলে তাকে কিছু না বলা কি ঠিক হবে তার ? তার জীবনের এতো বড়ো একটা ঘটনা—সোহাগী তার কিছুই জানবে না, তা কেমন করে হবে ?

যে তাকে তার সব দিয়েছে, তাকে সে কিছুই জানাবে না ?

আর ব্যাপারটা সে সোহাগীর কাছ থেকে লুকোতে চাইছেই বা কেন ? না, সে লুকোবে না কিছুই। আর যাই হোক, সোহাগীর সঙ্গে কোন রকম ছল চাতুরি সে করতে পারবে না।

আজও মৈনিমাসি ঘরে ছিল না। হাটে গেছে। মংলা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল ঃ সুহাগী—

ঃ তুই এয়েচিস্—

হাসি ভরা মুখে সোহাগী বেরিয়ে আসে।

মংলা চেয়ে দেখে, সোহাগী বড়ো রোগা হয়ে গেছে।

সোহাগী চুল বাঁধছিল। তেল চুঁইয়ে ঝরছে তার কপাল বেয়ে। খোঁপা বানাতে গিয়ে থমকে গেছে হাতটা। আর-এক হাতে বসবার পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে সে বলে ঃ এতদিনে মনে পড়লো সুহাগীকে ?

ঃ আমাকে তুই ক্ষেমা কর, সুহাগা। আমি তোর কাছে বড়ো দোষ করেচি।

ঃ এখন তো এই কথা বলবি তুই। ছমাসে তুই একবারও আসতে পারলিনি ? একবারও তোর মনে পড়লো নি আমার কথা ?

মংলা কি বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সোহাগী ঘরের ভেতরে চলে গেল। দুহাতে খোঁপাটাকে ঠিক করে বসাতে বসাতে বেরিয়ে এলো। মুখে রাগ বা অভিমানের চিহ্নমাত্র নেই। হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে উপচে পড়ছে তার।

ঃ আজ ক'দিন হলো, একটা হলুদ পাখি ঘরের চালের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম তুই আসবি।

মংলা সোহাগার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। তারপর ডাকে ঃ সুহাগী, শুন—

ঃ কি ?

ঃ কাছে বস্—

সোহাগী এসে বসলো তার সামনে। মংলা চাদরের ভেতর থেকে গয়নার পুঁটলিটা বের করে।

ঃ সুহাগী, তোর উব্‌গার কুনোদিন ভুলতে পারবো নি। তোর গয়নায় ডিঙি বানিয়েচি, টাকা রুজগার করেচি। আজ তোর জিনিষ তোকে ফিরৎ দিয়ে হাঁপ ছেড়ে দম লিব।

ঃ তাহ'লে তুই গয়না দিতেই—

ঃ না, তোকে দেখতেই—

ঃ মিছে কথা।

ঃ অন্য কথাও আছে। আগে গয়নাগুলো দেখে লে। তারপর বলচি—

সোহাগী গয়নার পুঁটলিটা ঘরের ভেতরে রেখে ফিরে এলো।

ঃ কি কথা রে?

মংলা কি ভাবে কথাটা বলবে, একটু চিন্তা করে নেয়।

ঃ কি ভাবচিস্, বল্ না?

কারো মুখে কোন কথা নেই।

ঃ না বলার হলে বলিস্ না।

ঃ না। তোকে বলতেই তো এয়েচি।

মংলা একটু থামে। তারপর বলে ঃ তোকে আমার ঘরে যেতে হবে—

ঃ তোর ঘরে? কবে লিয়ে যাবি, বল্?

মংলা আর সোহাগীর দিকে তাকাতে পারে না। মাটির ওপর দু চোখ রেখে বলে ঃ মাঘ মাসের পনের তারিখ।

সোহাগীও একটু থামে। তার গলায় কেমন যেন একটা ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে।

ঃ ক্যানে রে?

ঃ বিয়ে—

ঃ কার? তোর?

ঃ হুঁ—

ঃ বেশ। কার সাথে রে ?

ঃ মাছমারির চরে তুই ওকে দেখেছিস। জলের ঘটি হাতে আসতো।

ঃ দেখেছি।

ঃ ওই ময়না বউর সাথে।

ঃ অ—

ঃ যাবি তো ?

ঃ না।

ঃ ক্যানে ?

সোহাগী মুখ শুকিয়ে ঘরের ভিতরে উঠে চলে যায়। মংলা ডাকে ঃ সোহাগী, শুন্, শুনে যা। সুহাগী—

অনেকক্ষণ মংলা দাওয়ায় বসে থাকলো। সোহাগীর সাড়া নেই।

বাইরে বিকেল তখন থম্থম্ করে কাঁপছে। বনের পাতায় সোনালী রোদ্দুর ঠিক্‌রে পড়ছে। পাখিদের গলায় বেজে উঠেছে দিনান্তের বিদায়ের সুর।

মংলা ডাকে ঃ সুহাগী—

সোহাগী সাড়া দিল না।

ঃ সুহাগী—

ঃ উঁ—

দরজার আড়াল থেকে সোহাগীর কান্না-ভেজা স্বর ভেসে এলো। সোহাগী কাঁদছে। এতো কাছে—তবু সোহাগী সাড়া দিচ্ছে না কেন ?

ঃ কি হলো রে তোর ?

ঃ কিছু হয় নি—

ঃ ক্যানে যাবি নি, বল্ ?

ঃ তোকে বোঝাতে পারবো নি। তুই যা। আমি যাবো নি।

মংলা আরো কিছুক্ষণ বসেছিল চুপচাপ। কিন্তু সোহাগী আর তার সাম্‌নে বেরোয়নি।

মংলা শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করে ঃ যাবি নি ?

ঃ না।

ঃ ক্যানে রে ? রাগ করেচিস ?

ঃ রাগ করবো ক্যানে ? তুই যা। আমার শরীল ভালো নাই, আমি যেতে পারবো নি।

ধীরে ধীরে মংলা উঠে চলে আসে।

কেন সোহাগী আসবে না ? সে তো প্রথমে আসতেই চেয়েছিল। কিন্তু ময়না বউর সঙ্গে তার বিয়ে হবে—এ কথা শোনামাত্র সে তার কথা ঘুরিয়ে নিল। আর কেন সে আসতে চাইল না ? সে ময়না বউকে বিয়ে করছে—এতেই কি তার আপত্তি ? অথবা অন্য কিছু ? না, তা হতে পারে না। তেমন কোন ইংগিত তো সোহাগী তাকে কোন দিনই দেয় নি। শরীরেরই বা কি হলো সোহাগীর ? হ্যাঁ, বড়ো ম্লান লাগছিল বটে সোহাগীকে। কিন্তু কেন ? ম্লান সন্ধের মতো দু চোখে তার আজ সে এক গভীর বিষণ্ণতা দেখে এসেছে। সোহাগীর শরীর খারাপ ? কই, তা তো কখনো জানতে পারে নি সে। আর সোহাগীও তো তাকে সে কথা জানতে দেয়নি। তবে, তবে সে আসবে না কেন ?

মংলা সোহাগীর মনের কোন কূল কিনারাই পেল না। পথে চলতে চলতে তার কেবলি মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। একটা আশ্চর্য হেঁয়ালি—একটা গোপন জটিলতা। না, সে তার কোন সমাধানই করতে পারবে না।

মহিষাজোড়ের দোকান থেকে ময়না বউর জন্যে দু খানা শাড়ি কিনে সে বিষণ্ণমুখে ঘরে ফিরে এলো।

শাড়ি দু খানা হাতে পেয়ে ময়না বউ অবাক হয়ে গিয়েছিল। দু চোখে তার একটা লাজুক খুশি ভেসে উঠেছিল।

ঃ ই—মা। দু খানাই এনেছিস্। কী সোন্দর।

মংলা ক্লান্তভাবে বলে : তুই যে সোন্দর। তোকে সোন্দর শাড়ি না দিলে কি হয় ?

ময়না বউ মংলার মুখের দিকে তাকায়। ময়না বউর এমন চোখ মংলা কখনো দেখে নি। তার বুকের ভেতরে পূর্ণিমার জোয়ার যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

আর মাত্র দুদিন বাকি।

মাঝখানে আর একটা দিন। তারপর পনেরই মাঘ।

মংলার সঙ্গে ময়না বউর বিয়ে হয়ে যাবে। সব ঝামেলা চুকে যাবে। বুলানের স্মৃতি চিরদিনের মতো মুছে যাবে মাছমারি গাঁয়ের মন থেকে।

বিকেলের রোদ্দুরে নারকেল গাছের ছায়াটা একটা ডিঙির মতো যেন দোল খাচ্ছিল।

রাঘব চেয়ে চেয়ে ছায়ার দোল-খাওয়া দেখছিল।

ধীরে ধীরে চোখ দুটো তার ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। তার মনে হয়, সে বুঝি ডিঙিতে বসে আছে।

আর ওটা বুঝি ছায়া নয়; একটা ডিঙি। সমুদ্রের ঢেউএর বুকে ডিঙিটা যেন থেকে থেকে দোল খাচ্ছে। দেখতে দেখতে উত্তাল হয়ে উঠলো সমুদ্র, ঢেউগুলো যেন লক্ষ-কোটি সাপের মতো ফুঁসে উঠলো এক সঙ্গে।

একটা মোরগ ডেকে উঠলো গলা ফাটিয়ে।

একটা প্রকাণ্ড ঢেউএর ওপাশ থেকে যেন বুলানের সেদিনের সেই অসহায় চিৎকারের মতো শোনালো ডাকটা। বুকের ভেতরটা তার কেমন যেন হু হু করে উঠলো।

চোখ রগ্‌ড়ে চেয়ে দেখলো সে।

না, ডিঙি নয়; ছায়া।

রাঘবের চোখের ওপর থেকে যেন বার দুয়েক মোচড় খেয়ে কুয়াশার একটা পর্দা সরে গেল।

ময়না বউ কি একটা কাজে বাইরে এসেছিল। আবার সে ঘরের ভেতর ফিরে গেল। এই ময়না বউর কাল বাদে পরশু বিয়ে হবে মংলার সঙ্গে।

রাঘবের বুকের ভেতর সেই পুরোনো ব্যথাটা আজ আবার জ্বলে ওঠে। হঠাৎ তার কি হলো কে জানে, শুক্‌নো পানা-ভরা বালিশটাকে একটানে ছিঁড়ে ফেললো সে। তার শব্দে মুরগীগুলো শব্দ করে এদিক ওদিক ছুটে পালালো।

তারপর মাড়িতে মাড়ি চেপে রাঘব শুক্‌নো পানাগুলোকে বালিশটার বুকের ভেতর থেকে বের করে এনে দু হাতে ছড়িয়ে দিতে থাকে। আর তখনই—ঠিক তখনই তার গলা থেকে কেমন যেন একটা জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

উঠোনে সাঁড়া মোরগটা ঘাড় উঁচু করে এদিক ওদিক তাকায়।

রাঘব লাঠিতে ভর দিয়ে রাস্তাটাকে ক্ষতবিক্ষত করে চলে যায়।

আশ্চর্য একটা ক্ষ্যাপামিতে তাকে পেয়েছে আজ।

এখন সে সব করতে পারে। সমস্ত কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে সে। তার বার্ধক্য ঘুচে গেছে যেন। আজ সে কেমন যেন আদিম একটা জানোয়ারের মতো ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

দড়ির মতো পাক খেয়ে উঠেছে তার গলার শিরাগুলো। দু চোখে যেন পলাশ বনের লাল গন্‌গনে আগুন।

কানাই টিবির পাশ ঘুরতেই ঘনাইর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় রাঘবের।

ঘনাই রাঘবের চল্‌ার ভঙ্গি দেখে তাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে: কোথায় যাবি রে, মোড়ল?

উত্তরে রাঘবের গলা থেকে শূয়ারের আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে শুধু।

ঘনাই এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে। রাঘবের চোখে আগুন

জ্বলছিল। এক অব্যক্ত ক্রোধে কট্‌মট্‌ করে সে ঘনাইর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘনাই কি করবে ভেবে পায় না।

কিছু বলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজই বেরুতে চায় না। কথা বলতে গিয়ে শুধু একটা কাশিই বেরিয়ে এলো শেষ পর্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে রাঘব দু হাতে মাটিতে ঘন ঘন লাঠির ঠোক্কর মেরে তার দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা।

তারপর সে আর ঘনাইর মুখ দেখতে পায় নি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘনাইর পেছন দিকটা বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাঘব কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সোজা বালিয়াড়ির পথ। বালিয়াড়ির ওপারে সমুদ্র তার দু চোখে যেন করতালি দিয়ে নেচে ওঠে। সে বালির ওপর লাঠি ঠুকে সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকে।

সমুদ্র যেন তাকে দেখে শতবাহু বাড়িয়ে নেচে উঠছে।

ঃ তোকে ঠাকুর ভ্যাব্‌তা বলে সোব্‌বাই পূজো করে। রাক্কুসী! আমার বুলানকে তুই খেয়েচিস্‌। আমার পা-টাও যে খেয়েচিস্‌। নাহলে তোকে দেখিয়ে দিতাম—

বুকে জ্বালা আর চোখে আগুন নিয়ে রাঘব এগিয়ে যায়। দু হাতে লাঠি বাগিয়ে ধরে সে ঢেউএর মাথায় বাড়ি মারে। ঢেউ তাকে আছাড় মেরে বালির ওপর ফেলে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

এবার রাঘব ভিজে কাপড়ে চরের ওপর উঠে এসে দাঁড়ায়। নুড়ি, পোড়া কাঠ—দু হাতে যা পায় কুড়িয়ে তাই ঢেউএর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মারতে থাকে সে। আজ সে সমুদ্রের সঙ্গে একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে ছাড়বে। ঘনাইর সঙ্গেও সে আজ বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল: কিন্তু ঘনাই তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। যাক্‌, বেঁচে গেছে।

সে আজ সমুদ্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেবে। শেষ

বোঝাপড়া। যদি সে সমুদ্রের কাছে হেরে যায়, তবে সে আজ শেষ বারের মতো সমুদ্রে নেমে যাবে। না, আর সে উঠবে না।

যে সমুদ্র তার বুলানকে খেয়েছে, তাকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। তার সঙ্গে কোন আপোষ-রফা করতে পারবে না সে।

বুলানের সব স্মৃতি মুছে যাবার আগে সে নিঃশেষে মুছে যাবে।

বড়ো বড়ো নুড়ি আর পোড়া কাঠ তুলে ছুঁড়ে মারতে থাকে রাঘব। সমুদ্র নুড়িগুলোকে যেন গিলছে আর পোড়া কাঠের টুক্‌রোগুলোকে ফিরিয়ে দিচ্ছে ঢেউএর মুখে।

ঃ পোড়াকাঠগুলো ফিরিয়ে দিচ্চিস ; বুলানকে তুই ফিরিয়ে দিতে পারলি নি, সব্বোনাশী—

মাড়িতে মাড়ি চেপে রাঘব উচ্চারণ করে কথাগুলো।

সন্ধে হয়ে গেছে।

তবু রাঘব থামে না। কিন্তু বড়ো হাঁপিয়ে পড়েছে সে। গা-গতরে তার ব্যথা ধরে গেছে আজ। বুকের ভেতরকার জ্বালাটা একটু কমে এসেছে যেন। ভিজে কাপড়ে এবার কাঁপুনি দিয়ে শীত করছে তার।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘরে ফিরে এলো রাঘব।

দাওয়ার ওপর শুক্‌নো পানার চিহ্নমাত্রও পড়ে নেই। ছেঁড়া বালিশটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। রাঘব হাত বুলিয়ে অনুভব করলো, একটা আস্ত বালিশ চালের গায়ে জায়গা মতো রয়েছে। এ নিশ্চয়ই ময়না বউর কাজ। নিজেকে আজ কেমন যেন অপরাধী মনে হয় রাঘবের। মাদুর আর বালিশ পেতে গায়ে একখানা কাঁথা জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো সে।

মুখটা তার কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে আজ। যেন একটা প্রবল জ্বর থেকে সে এইমাত্র সেরে উঠেছে।

সোহাগীর কাছ থেকে মংলা বড়ো ভারি মন নিয়ে ফিরে এসেছিল

তার মনের সব খুশিকে সোহাগী চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল। ফেরার পথে সে কেবল সোহাগীর কথাই ভেবেছে এবং মনে মনে জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ পেয়েছে।

ভেবেছিল, সে আজ বহু দিন পরে সোহাগীর হাসি মুখ দেখে আসবে। কিন্তু সোহাগী আজ কান্না দিয়ে তার মনটাকে বড়ো শীতল করে দিয়েছে।

কদিন সোহাগীর নামেই সূর্য উঠলো, সোহাগীর নামেই সূর্য ডুবলো।

দেখতে দেখতে পনেরই মাঘ এগিয়ে এলো। কয়েকটা দিন ময়না বউর মনকে নতুন নতুন রঙীন অনুভবে ভরে দিয়ে গেল।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। আর একটা দিন মাত্র বাকি। একটা মাত্র দিন।

কাল পনেরই মাঘ।

বিকেলে মংলা রোদ্দুরের দিকে চেয়ে বসে কি ভাবছিল। কদিন হলো রাঘবও মাছমারির চরে আর কিছু খুঁজতে যায় না। সেও দাওয়ায় বসে কি যেন ভাবছিল। বুধিয়া কি একটা কাজে ঘর-বার করছিল। কিন্তু সব কিছুতেই সে একটু নিরাসক্ত।

এমন সময় সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ওদের উঠোনে মৈনিমাসির গলা শোনা গেল।

ঃ আমার সব্বোনাশ করে তুই নিশ্চিন্তে ঘরে বসে আছিস্?

ঃ কি হয়েচে মাসি?

মংলা কি করবে ভেবে না পেয়ে দাওয়া থেকে নেমে মৈনিমাসির দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

ঃ তুই কিছু জানিস্ না, না?

মৈনিমাসির গলাটা হঠাৎ খাটো হয়ে আসে।

ঃ তোকে আমি ভালো বলে জানতাম। তোর পেটে-পেটে এতো ছিল—

মংলা নিজেকে বিপন্ন বোধ করে। সে একবার রাঘবের দিকে তাকায়, একবার মৈনিমাসির দিকে। কি করে সে মৈনিমাসির মুখে চাপা দেবে, ভেবে পায় না। বিপন্ন গলায় সে জিজ্ঞেস করে ঃ সুহাগী ভালো আছে তো মাসি—

সঙ্গে সঙ্গে মৈনিমাসির গলা খ্যাঁক্ করে ওঠে ঃ ওকে ভালো রেখেছিস্ কি না যে ও ভালো থাকবে—

মংলা কি করবে ভেবে পায় না। এদিকে ময়না বউও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

রাঘবকে দেখিয়ে মৈনিমাসি বলে ঃ বুড়ো বুঝি তোর বাপ ?

মংলা মাথা নাড়লো।

ঃ আর ঐ রাঁড়িটা বুঝি সেই বউ ? ওর সাথেই তোর বিয়ে ?

মংলা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মৈনিমাসি রাঘবের দিকে এগিয়ে যায়।

রাঘবের একটা হাত ধরে মৈনিমাসি কেঁদে ফেলে।

ঃ যা হোক একটা বেবস্থা করে দে মোড়ল। না'লে মেয়ে আমার বাঁচবে নি।

রাঘব কিছু বুঝে উঠতে পারে না। মৈনিমাসি চোখের জল মুছে ময়না বউকে ডাকে ঃ বউ, তুই এ দিকে শুন—

ময়না বউ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে যেন সামনের বালিয়াড়িটার মতো অনড় হয়ে গেছে। মৈনিমাসি তার দিকে এগিয়ে যায়।

ঃ বউ, আমার মেয়েকে তুই বাঁচা। তুই ইচ্ছে করলে ও বাঁচে।

রাঘবের ভারি গলা দাওয়ার এক প্রান্ত থেকে ভেসে এলো ঃ কি হয়েচে তোর মেয়ের ?

ময়না বউকে টানতে টানতে মৈনিমাসি রাঘবের কাছে নিয়ে যায়। মাটির ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ে।

: তবে শুন্। সুহাগী আমার মেয়ে লয়, বুন্‌ঝি। ও আমার সাথে মাছ লিতে আসতো তোদের মাছমারির চরে। তারপর তোর ছেলেও গেছে আমার ঘরে। রাত্তিরে আমার ঘরে থেকেছে ও। আবার কবে কবে যেন গেছে ও। আমি ঘরে ছিলাম নি। খটি থেকে ফিরে ও আবার গেছ্‌ল। কি রে যাস্ নি ?

মংলাকে মৈনিমাসি জিজ্ঞেস করে। মংলা কোন কথা বলে না।

: ও সুহাগীকে কি বলে এয়েচে আমি জানি না। সেই থেকে মেয়েটা দিনরাত্তির কাঁদছে। খাওয়া দাওয়া করে না। বলে আমি বাঁচবো নি, মাসি। আমার যে কি হয়েছে, তোকে আমি বলতে পারবো নি। মোড়ল, না দেখলে তুই বুঝতে পারবি নি, কি সব্বোলাশ আমার হতে চলেছে। আমার আর কেউ নাই রে মোড়ল। ওই একটা মাত্তর বুন্‌ঝি—

রাঘব মৈনিমাসিকে চেনে। মাছমারিতে কতোদিন সে মাছ নিতে এসেছে। রাঘবের কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো। তারপর সে বলে : আমাকে কি বলতে চাস্ তুই ?

মৈনিমাসি রাঘবকে বলে : তোর ছেলে। তুই ইচ্ছে করলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারিস্—

: মংলা—

রাঘব ডাকে। মংলা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

: এদ্দিন তুই বলিস নি ক্যানে ?

মংলার মুখে কথা নেই।

: ময়না বউ—

ময়না বউ দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দেয়ালের অবলম্বন না থাকলে বোধহয় সে পড়েই যেত। পা দুটো টল্‌ছিল তার।

তার চোখের সাম্‌নে পৃথিবীটা যেন এক নিমেষের মধ্যে ভেঙে একেবারে ওলোট্ পালোট্ হয়ে গেল। অথচ এমন যে একটা কিছু

ঘটতে পারে, তা সে কোনদিনই ভাবতে পারে নি। তার দু চোখের সীমানা থেকে সব আলো, সব রং একটা মুহূর্তের ঝাপটে নিঃশেষে মুছে গেল। বুলান যেদিন সমুদ্র থেকে ফিরলো না, সেদিনও সে এত গভীর শূন্যতা অনুভব করে নি।

আজ তার এ কী হলো!

: ময়না বউ—

: উঁ—

: শুনলি সব?

মংলা কোন কথা না বলে ঘরের ভেতর থেকে চাদরটা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

: মাসি, চল্ তুই। আমি যাবো—

মৈনিমাসি ময়না বউকে জড়িয়ে ধরে : বউ তুই একটু মুখ ফুটে বল্, মা।

মংলা এগিয়ে আসে।

: তোরা কেউ জানিস না কি করে আমার ডিঙি হয়েচে—

সবাই চমকে মংলার মুখের দিকে তাকায়।

: মাসি, তুইও জানিস না। সুহাগীর থেকেই আমার ডিঙি হয়েচে। গোকুল গায়েন ডিঙি দিল নি শুনে সুহাগী আমাকে তার গয়না সব দিয়ে দিল। ঐ গয়না বন্দোক দিয়ে আমি ডিঙি বানিয়েচি।

মৈনিমাসি বলে : তারপর?

: তারপর খটি থেকে ফিরে গয়না ফিরৎ দিয়ে এয়েচি।

মংলা একটু থামে।

: চল মাসি, আমি তোর সাথে যাবো।

মৈনিমাসি ময়না বউর দিকে ঘুরে বসে।

: বউ, মুখ ফুটে একটি বার বল্—

সবাই ময়না বউর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ময়না বউ কি বলবে? ময়না বউ কি মংলাকে যেতে দেবে না? কিংবা তার যেতে

দিতে একেবারে ইচ্ছে নেই? মংলাকে যেতে দিলে তার আর কি থাকবে? কিছুই থাকবে না তার। থাকবে শুধু বিরাট একখানা শূন্যতা!

ময়না বউ উঠে দাঁড়ালো। ঠোঁট দুটো তার কেঁপে উঠলো একটু।

ঃ যা, ওকে নিয়ে যা—

তারপর এক দৌড়ে ময়না বউ চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

সূর্য ডুবে গেছে।

পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম বিষণ্ণতা।

রাঘব দলুইর ঘরেও আজ নেমে এসেছে একটা গাঢ় বিষণ্ণতা।

সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসছে দিনান্তের শেষ দীর্ঘশ্বাস। পলাশবনের গভীর থেকে পাখিগুলোও আজ গান ধরেছে বড়ো করুণ।

ময়না বউ মংলার কেনা শাড়িগুলো গোধূলির ম্লান আলোয় বের করে এনে হু হু করে কেঁদে ফেললো। ওগুলো আর তার গায়ে কোনদিন উঠবে না। টান মেরে ওগুলো ঘরের কোণে ফেলে দিল।

ময়না বউ আর ঘরে থাকতে পারলো না। বেরিয়ে পড়লো।

সামনের বালিয়াড়ির দিকে চলতে থাকে সে।

বিকেলে যে ঘটনা ঘটে গেল, বুধিয়া তার সমস্ত কিছুই দেখেছে। কিন্তু একটি কথাও বলে নি। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। অথচ একটি কথাও সে মুখ ফুটে উচ্চারণ করে নি। শুধু সে-ই আজকের ঘটনার নিরপেক্ষ দর্শক। দাওয়ায় বসে কি যেন ভাবছিল সে।

ময়না বউ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই তার বুকটা ভয়ে কেমন যেন শির শির করে উঠলো। সে আর বসে থাকতে পারলো না। ময়না বউর পেছন পেছন সেও চলতে থাকে। ময়না বউ বালিয়াড়ির ওপরে উঠে গেছে। বুধিয়া পেছন থেকে গিয়ে তার একটা হাত ধরে ফেলে।

ঃ বউ—

ময়না বউ চমকে পেছন ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম বিহ্বলতা ছড়িয়ে পড়লো তার চোখে মুখে। চুল বাঁধে নি আজ ময়না বউ। পশ্চিম আকাশের মতো সুন্দর লাগছে আজ ময়না বউকে।

সত্যি ময়না বউকে এত সুন্দর বুধিয়া কোনদিন দেখে নি।

ঃ বউ, কুথায় চলেচিস তুই ?

উত্তরে ময়না বউ শুধু আঙুল দিয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে ইশারা করে।

বুধিয়া চেয়ে দেখে, পলাশ বনের মাথায় আগুন জ্বলছে।

সূর্যাস্তের রক্তিম শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে বনের মাথায়। ফুল ফুটতে এখনো দুমাস দেরি। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাতা ঝরতে সুরু করেছে। আর আজ কেউ জানে না কেন, তার মাথায় একটা অনির্বচনীয় গোধূলি জ্বলছে ডগ্‌মগ্‌ করে।

ময়না বউ মাথাটা নিচু করে বলে ঃ ছাখ্‌ তো, সিঁথিটা আমার লাল হয়ে উঠেচে কিনা ?

বুধিয়া চেয়ে দেখে, ময়না বউর মাথার মলিন সিঁথিটা গোধূলির রং মেখে উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠেছে।

বুধিয়া ডাকে ঃ বউ—

ঃ এ ছাড়া আমার আর কি রইলো বল্‌ ?

ঃ তুই ক্যানে রাজি হ'লি, বউ ? ক্যানে তুই ওকে যেতে দিলি ?

ময়না বউ কি ভাবলো একটু।

ঃ ছাখ্‌, বারোটা বছর অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিলাম। আর কটা দিন এমনি অপেক্ষা করে কাটিয়ে দিতে পারবো নি রে ?

বুধিয়া ময়না বউকে কি বলবে ? কথা খুঁজে পায় না সে।

সে ময়না বউর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ময়না বউর মুখটা বড়ো করুণ, বড়ো বিষণ্ণ। ঠিক পলাশ বনের গোধূলির মতো।

ময়না বউ বলে ঃ তাছাড়া, যখন বুড়ো হয়ে যাবো, তখন তুই তো